উপন্যাস

পূর্ণ ছবির মগ্নতা

সেলিনা হোসেন

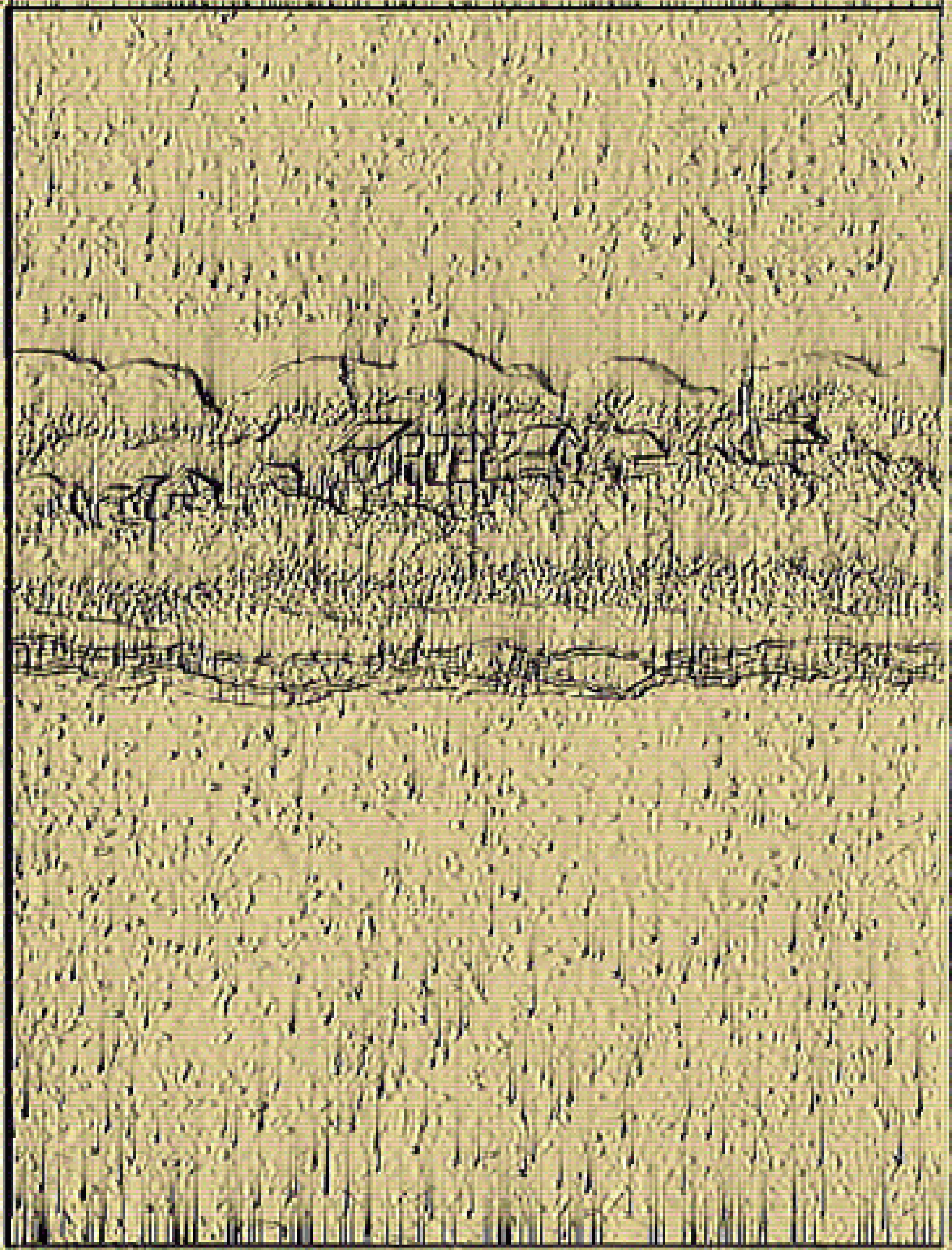

উপন্যাস

সেলিনা হোসেন

পূর্ণ ছবির মগ্নতা

ভীষণ মনোযোগে জমিদারির পুরোনো কাগজপত্র দেখছিলেন তিনি। এখন তিনি জমিদারির বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি শিলাইদহে। কুঠিবাড়ির তিনতলাটি তার লেখার ঘর-খুব প্রিয় জায়গা। এ ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে তার সামনে সেই পৃথিবীর ছবিটিই ফুটে ওঠে, যেটি তিনি আর অন্য কোনো দেশে পাননি। অনেক দেশের অনেক সুন্দর ছবি তিনি পেয়েছেন কিন্তু হৃদয়ের এত কাছের, এত ওমভরা, এত প্রাণমাতানো এবং এত আপন করা ছবি আর তার জীবনের সঞ্চয়ে একটিও নেই। এই ছবির সঙ্গে যুক্ত আছে একটি আশ্চর্য মায়াবী নদী। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো দিয়ে তিনি পড়ার ঘরটি ভরে ফেলেননি। এখন তিনি দোতলার বারান্দায়।

বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি কাগজপত্রগুলো উল্টাচ্ছেন। দেখে-টেকে একদমই বিরক্ত। নিজের বিরক্তিটুকু কাটিয়ে ওঠার জন্য কাগজ টেনে দোয়াতে কলম চুবিয়ে শ্রীশচন্দ্রকে লিখছেন, 'আমাদের বিরাহিমপুর সেরেস্তা সবচেয়ে বিশৃঙ্খল-আমি আজ মাস দুয়েকের অধিককাল এটাকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় আছি। এখনো পেরে উঠলাম না। এককালে এই পরগনা নীলকরদের ইজারাধীন ছিল, সেই সময়ে তারা অনাদরে কাগজপত্র সমস্ত নষ্ট করে বসে আছে। সেই অবধি এ পর্যন্ত এখানে গোলমাল চলেই আসছে।'

এটুকু লিখেই থামলেন তিনি। বাউল গানের সুর শুনে কান পাতলেন। ভারি মিষ্টি গলা। নারীকণ্ঠ। কথাগুলো আরও সুন্দর। তিনি দেখার চেষ্টা করলেন যে কে। এমন কতজনই তো আছে এ এলাকার চারদিকে। ওরা অনায়াসে সংগীতের সাধনায় ঢুকে যায়, অনায়াসে আয়ত্ত করে বাণী আর সুর। গানের সুর দূরে মিলিয়ে যেতে ফিরে আসেন নিজের জীবিকার কাজে।

রামলোচন ঠাকুরের কেনা এই বিরাহিমপুর পরগনা ঠাকুর পরিবারের সবচেয়ে পুরোনো জমিদারি। তারপর কতজনই তো দেখাশোনা করলেন, কড়ে আঙুলে হিসাব গুনলেন তিনি, কাজের মানুষের হিসাব-দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ-কেউই কাগজপত্র ঠিক করার চেষ্টা করেননি। করলেও এই বিশৃঙ্খল জঞ্জালে শৃঙ্খলা আনতে পারেননি।

তিনি হাসলেন। এবার তিনি এসেছেন জমিদারি দেখাশোনা করতে-তিনি কি পারবেন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে? চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়ে না-সূচক মাথা নাড়লেন। তারপর আবার সোজা হয়ে বসে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। না-পারার কিছু নেই-কাজগুলোকে অসাধ্য মনে করলেই অসাধ্য। তিনি ভীষণ মনোযোগী হয়ে উঠলেন। খেয়ালই করলেন না যে কে যেন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

অঞ্জলিভরা গন্ধরাজ ও করবী ফুল চুমু খেয়ে নিজের কপালে ঠেকিয়ে তার পায়ে সমর্পণ করে আনন্দী বোষ্টমী। তিনি চোখ তুলে তাকান না। দেখে আনন্দী বলে, তুমি আমার দিকে তাকাও না কেন গো?

আষাঢ় মাসের বিকেল বেলা।

সারা দুপুর ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি হয়েছে। মাঠ-ঘাট-দিগন্ত ধোঁয়াশা করে রেখে এখন ছাড় দিয়েছে। চারদিক পরিষ্কার। বেশ লাগছে। মেঘের ফাঁকে সূর্যের আধো আধো ফুটে ওঠা ভাব। অপরূপ কমলা আলো চারদিকে যৌবনের সুষমা নিয়ে প্রবল তীব্রতায় ঠিকরে উঠেছে। অথচ স্নিগ্ধ মায়াময় স্পর্শ সেই তির্যকভাবকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রেখেছে। যেন কোনো জাদুকরের অদৃশ্য মায়াবী খেলা। রবীন্দ্রর কাছেই যার আবেদন মূল্যবান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র বুঝতে পারে এমনই এক স্নিগ্ধ পরশ ওঁর চারপাশে সবগুলো ইন্দ্রিয় এক করে মালা গেঁথেছে।

কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে পায়ের কাছে বসে থাকা মানুষটির দিকে তাকাতেই মুগ্ধ দৃষ্টি আটকে যায় বোষ্টমীর চোখের তারায়-যেন নক্ষত্ররাজির সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে সেই মায়াময় অক্ষিগোলক অপরূপ আলোয় পূর্ণ।

বোষ্টমী ফুলগুলো দেখিয়ে বলেন, আমার ঠাকুরকে দিলাম। তুমি আমার গৌরসুন্দর।

কোনো উত্তরের আশা না করে বোষ্টমী চলে যান। গেরুয়া বসনের আঁচলে তখনো বেশ কিছু ফুল বাঁধা ছিল। দোহারা শরীর, বেশ লম্বা। রবীন্দ্রর মনে হয় 'একটি নিয়ত-ভক্তিতে তার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসঙ্কোচ তার ভাব। সবচেয়ে চোখে পড়ে তার দুই চোখ। ভেতরকার কী একটা শক্তিতে তার সেই বড় বড় চোখ দুটি যেন কোনো দূরের জিনিসকে কাছে করে দেখছে।' রবীন্দ্রর বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে ওঠা কঠিন। শুধু ভাবে, এ এলাকায় না এলে এমন নারী দেখা হতো না। এ এক কঠিন দেখা। এ নারীকে দেখা না হলে পূর্ণ হতো না নারীর শরীর দেখা। অস্থির রবি দ্রুত হাতে কাগজ গোছান।

বেয়ারা এসে বলে, বাবুমশায় চা।
চা!
পায়েসও এনেছি। পাকা পেঁপেও।
প্রসন্ন লেখার টেবিলের পাশে রাখা ছোট একটি টেবিলে সে খাবারের ছোট ডালাটা রাখে। সুন্দর কারুকাজ করা ডালা। মৃণাল যখন এখানে ছিল তখন গাঁয়ের কারও কাছ থেকে পছন্দ করে কিনেছিল। রবির তন্ময় ভাব দেখে বেয়ারা আবার ডাকে, বাবুমশায়।
আমার খিদে পায়নি প্রসন্ন।
কিন্তু আপনে রোজ এ সময়ে এটুকু খাবার খান।
ও আচ্ছা, দে।
পায়েসের বাটিটা টেনে তিনি খেতে শুরু করেন। দুই চামচ খেয়ে বলেন, প্রসন্ন তুই এই বোষ্টমীকে কত দিন ধরে চিনিস?
আমার জন্মের পর থেকেই তো দেখছি বাবুমশায়।
ও। তিনি গম্ভীর হয়ে পায়েস শেষ করেন।
শিলাইদহে বোষ্টমীকে সবাই সর্বক্ষেপী বলে ডাকে।
সর্বক্ষেপী! রবীন্দ্র কণ্ঠে বিস্ময়ের ধ্বনি।
হ্যাঁ, বাবুমশায়, ও একটা পাগলি।
প্রসন্ন জোর দিয়ে কথা বললেও তিনি আর প্রসন্নের দিকে তাকান না। বোষ্টমীর দুই চোখের দৃষ্টি তখন তার সামনে বিস্তৃত হতে শুরু করে এবং তিনি, শুধু তিনিই বুঝতে পারেন যে ওই দৃষ্টি নিয়ে পাগল হওয়া যায় না। মানুষটাকে বোঝার সাধ্য বিরাহিমপুর পরগনার কারও নেই। যদি তেমন কেউ থাকে তবে তাকে সময় নিয়ে কাছ থেকে বোষ্টমীকে দেখতে হবে।
বাবুমশায়। প্রসন্নর মৃদুকণ্ঠ ধ্বনিত হলে তিনি ওর দিকে না তাকিয়ে বলেন, তুই এখন যা প্রসন্ন। খানিক বাদে আয়।
তখন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন গলা-ছাড়া উদাত্ত কণ্ঠের গান–কোনো এক বিরহী উদাসী মানুষ মানবজীবনের সংলগ্নতা ছেড়ে আত্মিক পৃথিবীর পথে নিজেকে উজাড় করে চলে যাচ্ছে অমৃতের সন্ধানে–একজীবনে এ সন্ধান লাভ বুঝি হয়ে ওঠে না। তিনি নিজের ভেতর এক প্রবল ব্যাকুলতা অনুভব করেন। এমন এক ভাব বুঝি তাকে দীর্ঘ সময় ধরে অধিকার করে রেখেছিল বৌদি কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে।
তার আর পাকা পেঁপে খাওয়া হয় না। কাপে চা-ও জুড়িয়ে যায়। তিনি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন দূর প্রকৃতির দিকে। তার চোখ জলে ভরে ওঠে। বুকের ভেতর যন্ত্রণাটুকু মুছিয়ে দেয় প্রকৃতি। অদ্ভুত শান্ত-নির্লিপ্ত জীবনপ্রবাহের ভেতর নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন তিনি। বুঝতে পারেন বিরাহিমপুর ইউসুফ শাহি, কালীগ্রাম পরগনা তার শরীরজুড়ে চোখ গেঁথে দিয়েছে। এখন শুধু দেখার পালা, নেওয়ার পালা, দেওয়ার পালা। তাকে দুহাত ভরে তুলতে হবে। একটি মুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না। কাগজ টেনে ইন্দিরাকে লেখেন, ‘পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।’ কলম থামলে প্রবল হয়ে ওঠে বাউলের কণ্ঠ। তিনি চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে গান শোনেন।
প্রসন্ন এসে ডাকে, বাবুমশায়।
তিনি চোখ খোলেন না। বলেন, কী বলবি প্রসন্ন?
চা তো জুড়িয়ে গেছে। আর এক কাপ আনব?
না। একটুক্ষণ থেমে জিজ্ঞেস করেন, গগনটাকে ধরে আনতে পারবি?
ওর গান শুনেই আমি বুঝেছিলাম যে আপনি ওকে ডাকবেন। তাই লোক পাঠিয়েছিলুম। ও বলেছে, ও এ বাড়িতেই আসছে।
ও এলে ওকে দোতলায় আসতে দিস।
প্রসন্ন মাথা নেড়ে চলে যায়। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনে মনে হয় শব্দটা মৃদু কিন্তু সংগীতের মতো মাধুর্যময়, কেউ বুঝি নরম আঙুলের ছোঁয়ায় তবলায় বোল তুলেছে। আশ্চর্য! এখানকার পরিবেশটাই এমন–সবকিছুর ভেতর সুরের মূর্ছনা, সৌন্দর্য, রঙ এবং ছবির বিন্যাস কিংবা নাটক বা নৃত্যের মতো সারিবদ্ধ পাখির উড়ে যাওয়া। এখানকার সব

কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জীবন্ত মানুষ–কত তাদের কাজ, কত তাদের অভিব্যক্তি–মনে হয় হাঁ করে রাত-দিন তাকিয়ে থাকি। কলকাতা থেকে এভাবে বেরিয়ে না পড়লে এসব মানুষের দেখা পাওয়া যেত না–আর এদের সঙ্গে দেখা না হলে জানার যে বিস্তৃত ভুবন পড়ে আছে তার দরজা কোনো দিনই খোলা হতো না। বিধাতার সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখার সাধ বাড়িয়ে দেয়।

তখন গগনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কাছ থেকে। বোঝাই যায় যে ও বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকেছে। ও এখন গলা ছেড়ে গান গাইছে না, গুন গুন করছে। রবীন্দ্র সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ পান–শব্দই বলে দেয় যে ও প্রসন্ন নয়, ও পোস্টাপিসের ডাকহরকরা, সারা দিন ডাক নিয়ে এ-গ্রাম ও-গ্রামে ঘোরে। ওর পায়ের শব্দ তো মৃদু হতে পারে না, শব্দে ঝঙ্কারও থাকবে না, সেটা তবলার বোলের মতোও হবে না। হবে অন্য রকম–কাঠ চেরাই করা, মাছ ধরা কিংবা ক্ষেত চষা মানুষের মতো। ওর পায়ের শব্দ শিলাইদহের নিজস্ব সংগীত। ভাবতেই রবীন্দ্রর বুক ভরে ওঠে।

তখন শোনা যায় গগনের ডাক, বাবুমশায়।

আয় গগন, বোস। কেমন আছিস?

গগন বারান্দার কোনায় বসার আগে টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটা চিঠি রাখে। রবীন্দ্র হাতের লেখা দেখে বুঝে যান যে কে কোন চিঠিটা লিখেছে। ওপরের চিঠিটাই মৃণালীর। চিঠিটা খুলতে গিয়েও রেখে দিয়ে বলেন, তুই তো বললি না কেমন আছিন, গগন।

আজ্ঞে, ভালো বাবুমশায়।

কার গান গাইছিলি?

কাঙালের।

দুটো লাইন গেয়ে শোনাবি?

কী যে বলেন বাবুমশায়, আপনি হুকুম করলেই হয়।

গগন হরকরা গলা খাকারি দিয়ে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে মাথা ঝাঁকিয়ে গান ধরে:

কার হিসাব লিখছিস বোসে, মনের ঘোষে,
আপনার পথ মুলতবি রেখে।
ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে
পরের চোখে দেখছিস চোখে;
তবু তুই পরের, ভাবের বেঠিক, করছিস রে ঠিক,
আপনার বেঠিক ঠিক না রেখে।

গগনের উত্তাল কণ্ঠে কাঙাল হরিনাথের বাউলসংগীত কুঠিবাড়ির এলাকা ছেড়ে ছড়াতে থাকে শিলাইদহের মাঠে-প্রান্তরে, মানুষের বসতির কুঁড়েঘরে। রবীন্দ্র ওই পঙ্‌ক্তিটি শুনে সোজা হয়ে বসে গগনের দিকে তাকান–গগন মাথা ঝাঁকিয়ে, চোখ বুজে মনপ্রাণ ঢেলে গাইছে, 'পরের বেঠিক, করছিস রে ঠিক, আপনার বেঠিক ঠিক না রেখে'। রবীন্দ্র বুঝতে পারেন গগন এখন নিজেই বুঝি গানের স্রষ্টা, দার্শনিক অকপট চেতনায় একটির পর একটি রচনা করে চলেছে:

লিখছিস পরের বাকি যায়, আপনার দিন যায়
তোর ঠিকানা নাই যে দিকে;
পাগলেও আপনার ভালো, বোঝে ভালো,
আপনার ভালো না বোঝে কে।

রবীন্দ্র নিজের ভেতর অস্থির তাড়না অনুভব করেন। শিলাইদহে না এলে এই বাউলদের গান বুঝি শোনা হতো না, এই বাউলদের সঙ্গে পরিচয় হতো না–কাঙাল হরিনাথ মজুমদার যে বাউল ফিকির চাঁদ, এ তথ্যই বা কে তাকে দিতো? এখান থেকে কুমারখালী কতটুকু পথ যে মানুষটির সঙ্গে এখনো তার দেখা হলো না। বরীন্দ্র আবার এসে চেয়ারে বসেন। গগনের কণ্ঠে তখনো কাঙালের বাউলসংগীতের মূর্ছনা। সেই মূর্ছনা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে রবীন্দ্রর হৃদয়।

শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে;
হাবা লোকে ঠেকে শিখে
নিকেসে ঠেকবি যেদিন, বুঝবি সেদিন,
সরবে না তোর বাক্য মুখে।

গানের প্রতিটি পঙ্‌ক্তির এক একটি শব্দ কেমন করে যেন গগনের মুখের অভিব্যক্তি পাল্টে দিচ্ছে– রবীন্দ্রর মনে হয় তার ৩০ বছর বয়সের যাবতীয় অভিজ্ঞতা গগনের চেহারায় একটি বিশাল মানচিত্র তৈরি করেছে–কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, অভিজ্ঞতার এক-একটি ভূখণ্ড–কোনোটি ছোট, কোনোটি বিশাল–এ মুহূর্তে যেটি বিশাল সেটি বৌদির মৃত্যু–কাদম্বরী দেবী, যে তাকে জীবন প্রক্রিয়ার অনেকখানি শিখিয়েছিল–না শেখালে মানুষটির শেকড় উপড়ে যেত তার জীবনের জমিন থেকে। হায় বৌঠান!

গগন এখনো কাঙালের গানের ভেতর:

'ফিকিরচাঁদ ফকির বলে গেছে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নে রে দেখে;
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক;
তবেই নিকাশ দিবি সুখে।

রবীন্দ্র তখন নিজেকেই বলেন, হায় বৌঠান, নিজের হিসাবও ঠিকমতো শেখা হলো না, আর কতদিন লাগবে আমার হিসাব শিখতে? তখন ভীষণ কান্না পায়। নিজেকে সামলে নিলেও ক্রমাগত চোখ ভিজে আসে। থেমে যায় গগনের কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য নীরব হয়ে যায় কুঠিবাড়ির চারদিক। গগন অবাক হয়ে ডাকে, বাবুমশায়!

হ্যাঁ, বল গগন।

আমি যাই বাবুমশায়।

যাবি, একটুক্ষণ দাঁড়া।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন রবীন্দ্র। একটু পরে বলেন, তুই তো জানিস না গগন আমার বিয়ের রাতে এই শিলাইদহে, তোদের শিলাইদহে, এখন আমারও শিলাইদহে, আমার সৌদামিনী দিদির স্বামী সারদাপ্রসাদ হঠাৎ করে মরে গেলেন। মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এল বাসি বিয়ের দিন–আমাদের আনন্দের উৎসব শোকে পাথর হয়ে গেল। তোদের ফিকিরচাঁদ বাউলের মৃত্যুর গান নাই। বাউলের মৃত্যুচিন্তা?

আছে বাবুমশায়।

সে গান একদিন আমাকে গেয়ে শোনাবি।

আচ্ছা বাবুমশায়।

তুই এখন যা।

গগন সিঁড়ির দুই ধাপ নামতেই রবীন্দ্র আবার ডাকেন, গগন, শোন।

ও ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায় রবীন্দ্রর দৃষ্টি অনেক দূরে–যত দূর প্রান্তর দেখা যায়। রবীন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন, আমার বিয়ে হলো ৯ ডিসেম্বরে, তার মাস চারেক পরে বৈশাখের আট তারিখে আমার বড় বৌঠান আত্মহননের পথ বেছে নিল। তুমি তো জানো না গগন আমারও জন্ম হয়েছিল বৈশাখ মাসের পঁচিশ তারিখে। বৈশাখ নিদারুণ মাস। বৈশাখে আমার জলের তৃষ্ণা ফুরোয় না–যেমন ফুরোয় না এই প্রকৃতির–শিলাইদহ পতিসর শাহজাদপুর–এখানে না এলে তোমাদের মতো মানুষদের দেখাই হতো না। তোমাদের মতো মানুষের কাছে বুকের ভেতরে আটকে থাকা কথাগুলো গলগল করে বেরিয়ে আসে–কথাগুলো যদি জল হয় তাহলে তার সামনে কোনো চড়া নেই, সেটা বাঁধা পায় না।

হ্যাঁ শোনো, বলছিলাম বৌঠানের কথা। বৌঠানের মৃত্যুর পরে জ্যোতি দাদা জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। এ বাড়িতে আর বসবাস নয়–তার কতকাল পরে যেন বৌঠানের স্মৃতিমাখা তেতলার ঘরটি আমার দখলে আসে। আমি এখন বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ওখানে থাকি। কেমন করে আমার দিন কাটে সে আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ঘরে শিলাইদহের সবটুকু ছবি নিয়ে যখন ঢুকি, মনে হয় কোথায় যেন কী আটকে আছে–সেটা আর মুছবার নয়। জ্যোতি দাদা আর বৌঠানের সঙ্গে দশ নম্বর সদর স্ট্রিটের বাড়িতে থাকার সময় আমার দারুণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হলো। এসব কথা এখন থাক। তুমি সেই গানটি গাও দেখি গগন, তোমার অপূর্ব কণ্ঠের গানের সুর আমাকে পাগল করে দেয়, সেই যে 'আমি কোথায় পাব তারে। আমার মনের মানুষ যে রে।' গগন...

কোথাও কেউ নেই। অনেক দূর থেকে গগনের অস্পষ্ট কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। রবীন্দ্র আবার নিজেকেই বলেন, কী অপূর্ব কণ্ঠ! এখানকার বাউলেরা আমাকে পাগল করে দিল। ওদের গান শুনে আমার সামনে খুলে যায় এক-একটি দরজা। যে দরজা দিয়েই ঢুকি না কেন দেখি নতুন গৃহস্থালি–কত তার রূপ, কত তার বৈচিত্র্য।

কুঠিবাড়ি থেকে রবীন্দ্র আবার খোরশেদপুর গ্রামের পুরোটা দেখতে চান–এককালে এটাই তো গ্রামটার নাম ছিল,

শিলাইদহ এই গ্রামের অংশ। শিলাইদহ নামেরও কিংবদন্তি আছে। মানুষও কখনো কখনো কিংবদন্তি হয়। মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, বিশ্বাসের মধ্যে নিজেকে খোঁজে। নিজের আনন্দ আবিষ্কার করে এবং তার একটা স্থায়ী রূপ দিয়ে সে বিশ্বাসের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এভাবেই কি তৈরি হয়েছে খোরশেদপুর গ্রাম? সে মানুষটির একটি মাজার আছে এই গ্রামে। খোরশেদ ফকিরের দরগায় হিন্দু-মুসলমান ওরস পালন করে। মানত্ করে নিজের গাছের প্রথম ফলটি দিয়ে আসে কিংবা গাভির প্রথম দুধ। বিশ্বাস এই যে এটুকু করলে গাছ প্রচুর ফল দেবে, গাভি থাকবে দুগ্ধবতী। মানুষ এখনো বিশ্বাস করে, খোরশেদ ফকির একদিন খেয়া নৌকায় চড়ে নদী পাড়ি দিচ্ছিলেন। মাঝি তার কাছে পারাপারের জন্য কড়ি চাইল। ফকির বললেন, আমার কাছে তো কড়ি নেই। আমি আল্লার হুকুমে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। মাঝি রেগে বলল, আমি অতশত বুঝি না। পারানির কড়ি তোমাকে দিতেই হবে। কড়ি না থাকলে নৌকায় চড়লে কেন? ফকির পদ্মার উত্তাল তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে বাবা, তাহলে আমি নেমে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার শুভ্র ফেনিল জলস্রোতের মধ্যে ভেসে উঠল একটি চর। তিনি সেই চরে নেমে পড়লেন।
ওই চরই হলো ফকিরের আস্তানা। গড়ে উঠল বসতি। ফকিরের অলৌকিকতায় মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। একদিন ফকিরের মৃত্যু হলে তার মাজার হলো দরগা। এ কিংবদন্তির কথা কতবার শুনতে হয়েছে তাকে? না এর কোনো হিসাব নেই। অসংখ্যবার শুনে ঘটনাটার এক ধরনের অভিঘাত তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রর মনে হয় মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানতে নেই, তাকে সহজ-সুন্দর পথে এগিয়ে দেওয়াই উচিত। তা যেন কলুষিত না হয়।
বাবার সঙ্গে কৈশোরে এসেছিলেন এই শিলাইদহে। বোটে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন পদ্মায়, দেখেছিলেন ঠাকুর এস্টেটের সীমানা, তার প্রকৃতি এবং মানুষ, যে মানুষদের এত কাছ থেকে কলকাতায় দেখা হয়নি। তখনই শুরু হয়েছিল নদীর সঙ্গে প্রেম। কেমন করে যেন মানুষ আর নদীকে এক করে দেখতে শিখেছিলেন। এখনো সেই ঘোরে আছেন। বোটে উঠলে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। চঞ্চলতা বাড়ে শরীরেও। আশ্চর্য, আবার খুলে যায় দরজা, আবার নতুন গেরস্থালি–নদী এবং নদীর জীবন। রবীন্দ্র চেয়ারে এসে বসেন, গগনের রেখে যাওয়া চিঠিগুলো হাতে নিয়ে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান।
যৌবনে একবার নিজে ছিপনৌকা বেয়ে পারাপার করেছিলেন পদ্মা নদী। এপার থেকে ওপার, ওপার থেকে এপার। কী অদ্ভুত রহস্যময়তায় নদীর স্রোত, আকাশ, গ্রাম এবং কুঠিবাড়ির ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যোতি দাদা এক হয়ে গিয়েছিলেন। শান্ত-স্নিগ্ধ কণ্ঠে জ্যোতি ডাকলেন, রবি এবার উঠে আয়। অনেক হয়েছে।
আসছি দাদা।
দূর থেকে দাদার সবটুকু অবয়ব এবং কুঠিবাড়ির খণ্ডিত অংশ জুড়ে গিয়েছিল গিয়েছিল তার সামনে। মনে হয়েছিল, এই পদ্মাপারের জীবন থেকে তুলতে হবে মুক্তো। এ এক আশ্চর্য সোনার খনি। এর সবখানে কত কী ছড়িয়ে আছে! খুঁটিয়ে তুলতে হবে সবটুকু। একটুও ফেলে রাখা যাবে না।
বেলা বাড়ছে। রোদের বান ডেকেছে বুঝি, চারদিক কেমন উথাল-পাথাল করছে। একটা কিছু লেখার জন্য তৈরি হচ্ছে মন। চিঠিগুলো খোলা হয় না। গুন গুন করতে থাকেন। একটা গান তৈরি হচ্ছে ভেতরে। সৃষ্টির কী অপূর্ব রহস্যময়তা। নিজেকে চেনা তখন কঠিন, বেরিয়ে আসতে থাকে রবির কিরণ–কখনো মানুষের মুখ হয়ে, কখনো অদৃশ্য কিছু–ধরা যায় না।
বনমালী কাছে এসে দাঁড়ায়।
বাবুমশায়।
রবীন্দ্র চোখ তুলে তাকান। ঝকঝকে দৃষ্টির তীক্ষ্ণ বাঙ্ময় প্রাঞ্জল জ্যোতি ঠিকরে আসে। চাউনি তো নয়, অন্তর্ভেদি তীক্ষ্ণতা–বাইরে থেকেই অবলোকন করে ভেতরটা। বনমালীর মুখে কথা সরে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।
কী রে কিছু বলবি?
আজ্ঞে–
থামলি যে।
দুপুরের জন্য কী রান্না হবে জানতে চাইছিলুম।
হো-হো করে হাসেন রবীন্দ্র, যেন উৎসমুখ খুলে যাওয়া জলরাশি। বনমালী শিহরিত হয়। কী আশ্চর্য সুন্দর মানুষ তিনি, কেবলই চেয়ে থাকার সাধ হয়।
বল কী বলবি বনমালী?
একজন জেলে পদ্মার ইলিশ দিয়ে গেছে। ইয়া বড়। পেটভর্তি ডিম।
দাম দেওয়া হয়েছে তো?

হ্যাঁ, দিয়েছি। বেটা দাম নিতে চাইছিল না। বলল, হুজুরকে আমরা আর কীইবা দিতে পারব, দুটো মাছই তো। বললুম, মতলব কী বল তো? ঘরে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে বুঝি? বেটা তড়িঘড়ি বলে ফেলল, শুধু কী বিয়ের যুগ্যি, কালো মেয়েটার জন্য ছেলে জোগাড় করার দায়ে পড়েছি। বাবুমশায় ইচ্ছে করলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে।
ওকে কাছারিতে আমার কাছে আসতে বলিস।
কিন্তু ওকে মাছের দাম দেওয়া হয়েছে বাবুমশায়। যখন বললুম দাম না দিলে বাবুমশায় রেগে আগুন হয়ে যাবেন, তখন আর রা কাড়েনি। টাকা নিয়ে চলে গেছে।
তবু তুই ওকে আমার কাছে আসতে বলিস।
বনমালী ঘাড় নেড়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবুমশায় লোকটাকে আসতে বলায় ওর হিংসে হচ্ছে। এমন করলে কি জমিদারি টিকবে! বনমালী বাবুমশায়ের বোকামির জন্য দুঃখ পায়। আর বাবুমশায় তখনো বলছেন, এ বাড়িতে কেউ কোনো জিনিস আনলে পয়সা না নিয়ে যেন বিদেয় না হয় বনমালী। আহা রে, গ্রামের মানুষ কত যে গরিব। বাবা-দাদারা তো লোক রেখে জমিদারি চালিয়েছে। ওরা এখানকার মানুষদের একটুও বোঝেনি। প্রজাদের নালিশ আর কান্নাই তো নিত্য শুনছি। সাধে কি ওই বাউল কবি গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বের করে সম্পাদক হয়েছে। লিখছে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।
বনমালী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। ও মাথা তুলবে কার সামনে। এসব কথা শুনতে ওর ভালো লাগছে না। ও এত কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝল কি না ভেবে রবীন্দ্র বলেন, তুই এখন যা বনমালী!
জল তুলে দেব, চান করতে?
হ্যাঁ, বিপিনকে বল।
চিঠিগুলো তো খোলেননি বাবুমশায়।
খুলব রে। মন ভালো নেই। আজ কেবলই নানা কথা মনে পড়ছে।
শরীর খারাপ লাগছে?
না, শরীর ঠিক আছে।
তবে আমি যাই।
বনমালী নেমে যায়।
রবীন্দ্র তাকিয়ে দেখেন নিচে আমলারা কেউ কেউ কাছারিতে ঢুকছেন। নায়েব আগেই এসেছেন। এসেছেন বেশ কয়েকজন প্রজাও। এখনো ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে আছে এ পরগনায় আসার কথা। পিতার আদেশে জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। কী ভয়ানক ছিল যাত্রাপথ–শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে নৈহাটি, রানাঘাট, চুয়াডাঙা হয়ে কলকাতা থেকে ১১২ মাইল দূরে কুষ্টিয়া। সেখান থেকে ষোল বেহারার পালকিতে করে ছয় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বিরাহিমপুর খোরশেদপুর গ্রামে, তারপর সে গ্রামের শিলাইদহ কুঠিবাড়ি এবং সদর কাছারি। সবটাই একটা তৈরি করা নকশা–বুনলেই হয়, অনবরত ফুটতে থাকে। এখানে আসাটা নকশায় ফুটে ওঠা। বয়স তো ছিল মাত্র ৩০। তত দিনে বাবা হয়েছে আর এক প্রজন্মের ভিত গড়ে উঠছে। বিরাহিমপুর এই ভিতকে প্রাণ দেবে, বায়ু দেবে, আলো দেবে–কত দিন? মানুষ কতবার নতুন জীবন পায়?
প্রশ্নের উত্তর নেই। শুনতে পান বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, রোশন চৌকি, হুলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে কাছারি মুখর। গমগম করছে চারদিক। নতুন বাবুমশায়কে দেখার উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে মানুষ। ওদের মধ্যে ফিসফিস গুঞ্জনধ্বনি। এত দিন বাবুরা ঠিকমতো দেখাশোনা করেনি। বাবুদের হয়ে জমিদারি দেখাশোনা করেছে অন্যরা–তারা জুলুম করেছে, কেড়ে নিয়েছে, চোখ রাঙিয়েছে। নতুন বাবুমশায়ও কি তা-ই করবেন? কে জানে তিনি কেমন মানুষ হবেন? প্রজাদের নানা চিন্তার শেষ নেই। তারপরও আনন্দ করতে চায় মানুষ, আজ পুণ্যাহ উৎসব। নতুন বাবুমশায়কে খাজনা দিতে হবে–প্রতীকী খাজনা, কিছু না কিছু।
মুহূর্তে শোরগোল থেমে যায়।
বাবুমশায় কাছারিতে নেমে আসেন। জোড়া জোড়া চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি হাঁ করে দেখে তাকে। দেবতা নাকি অন্য কিছু? ধুতি গিলেকরা পাঞ্জাবি পরেছেন, কাঁধের ওপর পড়ে আছে চাদর। শান্ত-সৌম্য দৃষ্টি। প্রাণের স্পন্দনে হিল্লোলিত হয়ে যায় সদর কাছারির আঙিনা। বাবুমশায় সিংহাসন আদলের চেয়ারে বসলে প্রথামতো শুরু হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের প্রার্থনা, পরে হিন্দুমতে পূজা। পুরোহিত তার কপালে চন্দনের তিলক দেন। এরপর প্রদান করেন নতুন কাপড়, চাদর, দধি, মাছ ও দক্ষিণা। এরপর প্রজারা প্রতীকী খাজনা দিতে শুরু করে। জমিদারি প্রথার আনুষ্ঠানিকতা। বাবুমশায় চারদিকে তাকান। তার দুই চোখের দৃষ্টি সহস্র চক্ষু হয়ে যায়। পরিস্থিতি বুঝে ফেলেন। আগেও তার কিছু

কিছু জানা ছিল, কিন্তু সামনাসামনি দেখা হয়নি। তার ভেতরে আগুন জ্বলতে শুরু করে। এসব বিষয় মানলে তো তার মানবজনম বৃথা। এভাবে চলতে দিতে পারেন না তিনি। পরিবর্তন চাই, মনুষ্যত্বের আবমাননা যেন না হয়।
রবীন্দ্র বিরক্ত হতে থাকেন–ভেতরের আগুন দাউ দাউ করে ওপরের দিকে উঠছে। ইশারায় ম্যানেজারকে ডাকেন। তার চেহারা বদলে গেছে, চোখে অসন্তোষের ছাপ। প্রজাদের মধ্যে ফিসফিস গুঞ্জন ওঠে, খানিকটা অসৃস্তিও–কী হয়েছে বাবুমশায়ের? ম্যানেজার এগিয়ে এলে রবীন্দ্র স্পষ্ট বলেন, আমি এভাবে পুণ্যাহ উসব হতে দিতে পারি না।
কী হয়েছে হুজুর?
পুণ্যাহ মিলনের দিন। সবাই মিলে মন খুলে, ভেদাভেদ ভুলে আনন্দ করবে। কিন্তু উৎসবের আয়োজনে দেখতে পাচ্ছি বেজায় গরমিল। বসার ব্যবস্থায় এমন ভেদাভেদ করা হয়েছে কেন?
আমরা তো নতুন কিছু করিনি।
নায়েব গোমস্তারা শংকিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই তটস্থ। বাবুমশায় না জানি কী হুকুম দেবেন।
আমি জানি আমার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে এই ব্যবস্থা শুরু হয়েছে এবং এখনো চলছে। পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে সম্?ম ও জাত-বর্ণ অনুযায়ী আসনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এখন থেকে আর হবে না।
হুজুর, কোনো নতুন আদেশ দেবেন?
হ্যাঁ, দেব। তাকিয়ে দেখেন আসনের দিকে। হিন্দুরা বসেছে চাদর-ঢাকা শতরঞ্জির ওপর এক পাশে, এর মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের স্থান আলাদা। মুসলমান প্রজারা বসেছে চাদর ছাড়া সতরঞ্জির ওপর। তাদের অন্য ধারে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সদর ও অন্য কাছারির কর্মচারীরা নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী পৃথক পৃথক আসনে বসেছেন। আর জমিদারের জন্য রাখা হয় ভেলভেটমোড়া সিংহাসন।
আসনের এই ব্যবস্থায় আমি জাতভেদ মানব না।
সদর নায়েব এগিয়ে এসে একটু রূঢ় কণ্ঠে বলেন, এটাই মিয়ম। এভাবেই চলে এসেছে। চাইলেই নিয়ম বদলানো যায় না।
যায়। রবীন্দ্রর রুক্ষ ওষ্ঠে উত্তাপ। নিয়ম বদলানো যায় না এমন দর্শন আপনি কোথায় পেলেন নায়েবমশায়?
অসম্ভব, নিয়ম ভাঙা চলবে না।
শুভ অনুষ্ঠানে আমি মানুষের অপমান সহ্য করব না। সব আসন তুলে দিয়ে সবাইকে একই আসনে বসতে হবে। জমিদার হিসেবে এই আমার প্রথম হুকুম।
স্তব্ধ হয়ে যায় উৎসব পরিবেশ। সদর নায়েব এবং হিন্দু আমলারা একসঙ্গে বলে উঠলেন, পুরোনো প্রথার পরিবর্তন ঘটালে আমরা সবাই একসঙ্গে পদত্যাগ করব।
আপনাদের যা ইচ্ছে তা করবেন।
রবীন্দ্র প্রজাদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা সবাই আলাদা বসার ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলে এক হয়ে বসো। আমিও বসব। আমি তোমাদেরই লোক।
মুহূর্ত সময়ের অপেক্ষা নয়। প্রজারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে বড় হলঘরের চাদর, চেয়ার সরিয়ে ফরাসের ওপর বসে পড়ে। একইসঙ্গে সবার মধ্যে বসেন রবীন্দ্র নিজেও।
কেউ কেউ তাকে প্রণাম করে বলে, আজ আমার নতুন জন্ম হলো।
বাবুমশায় আমার জীবন ধন্য।
এই জীবনে প্রথা ভাঙা দেখতে পাব সৃপ্নেও ভাবিনি বাবুমশায়।
ওই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নায়েব আর আমলাদের তোমরা ডেকে নিয়ে এসো। উৎসব সবাইকে নিয়ে হবে। কাউকে বাদ রেখে নয়। আমি ওদের অনুরোধ করব যেন পদত্যাগ না করেন।
মিলন উৎসব জমে ওঠে। চারদিকে খুশির রোল–প্রজারা ছুটে আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। ওরা মুখে মুখে ছড়াতে থাকেথ–পুণ্যাহ উৎসবে শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা উঠে গেছে। উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি থামে না। সঙ্গে বাজে মাদল, আকাশে বাতাসে ভেসে যায় বাউল গান। রবীন্দ্রর মনে হয় কানায় কানায় ভরে উঠেছে হৃদয়। এই পূর্ণ পাত্র নিয়ে যেতে হবে অনেক দূর–এর সবটাই অমৃত নয়, গরলও থাকবে। তাতে কিছু এসে যায় না, মঙ্গলের পথে লড়াইটা অমঙ্গলের হাত ধরে এগোয় না। তার চেয়ে এ সত্য বেশি আর কে বুঝবে। ঠাকুরদাদা, বাবা, দাদারা প্রজাপীড়ক জমিদারের খাতায় নাম উঠিয়েছিলেন। সে গ্লানি ঘোচাতে না পারলে কী জন্যইবা তার এই পরগনায় আসা।
সেদিনের কথা মনে করে রবীন্দ্র চান করতে যান। বিপিন জল তুলে দিয়েছে। ঘড়ায় ভরা নদীর জল। বড়কে কি ক্ষুদ্রের মধ্যে বাঁধা যায়? গায়ে জল ঢাললেও সারা শরীর শীতল হয় না। সেদিনের পর থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন যে

সামনের দিনগুলো আর এমন অবাধ, স্নিগ্ধ, রূপময় থাকবে না। শুরু হবে সংঘাত। গরিব প্রজারা ভাবছে তাদের দুঃখ বুঝি ঘুচবে এবার, আর নায়েব আমলা-মহাজনেরা বুঝে গেছেন যে শোষণটা আর আগের মতো সহজ হবে না। সেদিনের পরই একরকম ঘোষণার মতো বলেছিলেন, সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার প্রধান কাজ।

তার কাছে সাহারা ছিল মহাজন, আর প্রজারা শেখ। রবীন্দ্র গায়ে-মাথায় জল ঢালতে ঢালতে নিজের অবস্থানটা শক্ত করে নেন। যা ভাবা তা-ই কাজ, একচুলও নড়া যাবে না। সে অবস্থাতেই উপেনের কথা মনে হয়। লোকটা এখন আর আগের মতো সামনে পড়ে না। কোথায় কোথায় নাকি দিন কাটে। এখন তার ভিটেটুকুই সম্বল। রবীন্দ্রর মনে হয় শোষণে-অপমানে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মানুষের চেহারা দেখা হতো না যদি বাবা এই এলাকায় না পাঠাতেন; এখানে না এলে জমিদারি ব্যবস্থার অপকর্ম কত রকমের হয় তা বোঝা হতো না। উপেন নামের দরিদ্র মানুষটির দুই বিঘা জমির হাহাকার মুছে দেওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই আর। ওখানে দালান উঠে গেছে, দালানের নিচে চাপা পড়েছে–। ভাবনা এখানেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, মাথার গুটি পাকিয়ে ওঠে কবিতা। স্নান শেষে দরজা খুললে গামছা এগিয়ে দেয় বিপিন। রবীন্দ্র হাত বাড়িয়ে গামছা নেন।

বাবুমশায় আজ অনেকক্ষণ ধরে চান করলেন।

রবীন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, কিছু হবে না। দেখিস ঠাণ্ডা লাগবে না।

বিপিন চুপ করে থাকে। ওর কোচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্র বলেন, বলতে চাইছিস যে কাজটা ঠিক হয়নি। নারে?

বিপিন মাথা নিচু করে। পরিষ্কার ধুতি আর পাঞ্জাবি রেখে এসেছে বিছানার ওপরে। বাবুমশায় ঘরে গিয়ে সেগুলো পরবেন। কাছারিতে গিয়ে বসবেন।

কাছারিতে কত যে কাজ!

বিপিন বলে, মা-জননী কবে আসবেন বাবুমশায়?

সেই যে কটা মাস থেকে গেলেন, তাও তো মেলা দিন হলো–

ছেলেপুলে নিয়ে সংসার, কত হাজার ঝামেলা, তার কি দম ফেলার সময় আছে রে?

আর কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে রবীন্দ্র নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। ভাবেন, প্রথমবার যখন মৃণালিনী এসেছিল তখন কী-না কাণ্ড করেছিল! সে সময় সবাই মিলে বোটে থেকেছিল। পদ্মা আর বোট কত কিছুর সাক্ষী।

কিছুদিন পর পতিসর যেতে হবে। কালীগ্রাম পরগনা। তারপর শাহজাদপুর। নায়েবকে এ যাত্রার ব্যবস্থা করার কথা বলতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইন্দিরাকে চিঠি লেখার একটা খসড়া মনে মনে ঠিক করে ফেলেন: 'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে। এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো–নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনো মতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।'

কাছারিতে নেমে নিজের আসনে বসলে নায়েব হিসাবের খাতাটা এগিয়ে দেন। জমা-খরচের হিসাব লেখা হয়েছে। নিজে সব কিছু ঠিকমতো মিলিয়ে না দেখে স্বাক্ষর করেন না। প্রতি সপ্তাহে কলকাতায় বাবাকে হিসাব পাঠাতে হয়। চাষিদের কাছ থেকে খাজনা বাবদ যা পাওয়া গেছে তার হিসাবে লেখা হয়েছে এভাবে: ১. পরগণা বিরাহিমপুর জমা ৫২,৮৫৭, ২. ডিহি শাহজাদপুর জমা ৭৮,৭৩৮/৪, ৩. পরগণা কালীগ্রাম জমা ৫০,৪২০।/...। এভাবে মোট খরচের জমা দেখা হয়, গত বছরের বাকি কেটে রাখা হয়।

বাবুমশায়।

করুণ কণ্ঠের আর্তি ওঠে। রবীন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন।

কী হয়েছে?

মাসখানেক ধরে আমার ছেলেটা ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। আজ ভোরে...। কথা শেষ হয় না। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে নরেন। কাঁদতে থাকে। রবীন্দ্র বুঝে যান সমস্যা কোথায়।

নায়েব বেশ জোরেশোরেই বলেন, গাঁয়ে ম্যালেরিয়ার জোর বেড়েছে। রোজই একজন-দুজন শেষ হচ্ছে।

নরেনের ছেলের দাহের ব্যবস্থা করে দিন। আর ম্যালেরিয়া দমন করার জন্য কী করা যায় সেটাও আমাদের দেখতে হবে। গাঁয়ের মানুষকে তো আমরা ম্যালেরিয়ার হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।

নায়েব চুপ করে থাকেন। ভেতরে ক্রোধ বাড়ে। দাঁত কিড়মিড় করে উঠতে চাইলে অতি কষ্টে দমন করেন–পাছে সেই

শব্দ জমিদারের কানে গিয়ে ঢোকে। ঢুকতে সময় লাগে যা, কান তো নয় যেন শব্দ-ধরার যন্ত্র। বাবা, এমন মানুষও কি হয়?

রবীন্দ্র নায়েবের মনোভাব আঁচ করতে পারেন। এরা যে নানাভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষে নেমেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। নরেনের ছেলের যদি সারা দিনে দাহ না হয় তাহলেও অবাক হবেন না রবীন্দ্র। তারপরও গলাটা উঁচু করেই বলেন, তুমি কিছু বলছো না যে অহীন্দ্র?

ঠিকমতোই ব্যবস্থা হবে বাবুমশায়।

নরেন তখনো গুনগুনিয়ে কাঁদছে। দাহের ব্যবস্থা হবে শুনে চোখ মুছে বলে, বাবুমশায় আমার কী যে সর্বনাশ হলো। ওই একটি মাত্র ছেলে ছিল। আর আছে গণ্ডা দুয়েক মেয়ে। আমার বংশরক্ষা বুঝি হলো না হুজুর।

বংশরক্ষা! নুন আনতে যার পান্তা ফুরোয় তারও বংশরক্ষার দায় থাকে। ঠাণ্ডা গলায় বলেন, তুমি বাড়ি যাও নরেন। মেয়েগুলোর যত্ন নিয়ো। ওদের যেন ম্যালেরিয়া না ধরে।

দুটো মেয়ে তো এর মধ্যে বিছানা নিয়েছে। কী হবে কে জানে।

অবলীলায় কথাগুলো বলে যায় নরেন। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ নেই। যেন মেয়ে দুটো বাঁচা-মারা তেমন কোনো বিষয় নয়। ছেলেটাকেই ভগবান নিয়ে গেলেন। নরেন গামছা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়। নায়েবের ইঙ্গিতে পেছনে পেছনে যায় গোমস্তা হরিহর। ঘরের বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর পা ফেলার জোরাল শব্দ শুনতে পায় রবীন্দ্র। বুঝতে পারে একই সঙ্গে হরিহর নরেনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, ছোটলোকের দল মরার আর সময় পায় না। বাবুমশায় কলকাতায় থাকলে হয়েছিল। ছোটলোকের মরা দাহ করতে শ্মশানে টেনে নিয়ে যাওয়ার মজা বের করে দিতুম। যত্তসব।

প্রজারা তাকে বলেছে হুকুমের পরে এমনই আচরণ পায় ওরা কাছারির হর্তাকর্তাদের কাছ থেকে। কী আর করা, এসবের মধ্য দিয়েই এগোতে হবে। ধৈর্য রাখতে হবে।

হরিহর খানিকটা এগিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নরেনকে বলে, ম্যালেরিয়ায় দুটো মেয়ে বিছানা নিয়েছে বলেছিস। যদি দুটোই মরে তাহলে নিজে দাহের ব্যবস্থা করবি। বাবুমশায়ের কাছে নাকিকান্না কাঁদতে গেলে ভালো হবে না বললুম। এমন শিক্ষা দেব যে চৌদ্দগুষ্টির নাম ভুলে যাবে।

নরেন গলা উঁচিয়ে বলে, কী করবে, অ্যাঁ!

বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেব। বাবুমশায় কলকাতা গেলেই হয়।

পুড়িয়ে দিয়ে দেখো না বাবুমশায়ের কাছে নালিশ…

হরিহর মুখ ভেংচি কেটে বলে, নালিশ। দিয়ে দেখিস নালিশ। নালিশের পরে এই শিলাইদহে হয় তুই থাকবি নয়তো আমি।

নরেন আর কথা বাড়াতে সাহস পায় না। ছেলের শোকে কাহিল হয়ে পড়ে। গরিবের সাহস পান্তাভাতে ছাই। ওর বুক ফেটে যায়। ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি আসে। এসে শুনতে পায় জোর কান্নার রোল। তার স্ত্রীর চিৎকার শিলাইদহের আকাশ ভারী করে তুলেছে। বাবাকে দেখে ছুটে আসে বড় মেয়ে জবা।

বাবা বেলি নেই। শেষ।

হরিহর নরেনের হাত চেপে ধরে বলে, ভালোই হয়েছে। দুটোর দাহ একবারেই সম্পন্ন করা যাবে। তোকে আর কাছারি বাড়ি গিয়ে নাকিকান্না কাঁদতে হবে না। যা, বাড়ির ভেতরে যা। বাকিটা আমি দেখছি।

শালা কুত্তার বাচ্চা। তুই মানুষ না।

নরেন খেঁকিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিহরের ওপর।

ধমাধম কিল-ঘুঁষিতে ধরাশায়ী করে ফেলে হরিহরকে। হরিহর এই আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে যায়। ছোটলোকের এত সাহস দেখে ওর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, ওই জমিদারটা তোদের বাড় বাড়িয়েছে।

খবরদার, আর এক পা এগোবি না। এগোলে তোকে আমি কেটে দু টুকরো করব।

হরিহর চুপসে যায়। কথা বাড়ায় না। জমিদার পর্যন্ত কথাটা গড়ালে ওর কপালে দুঃখ আছে। হে হে করে বলে, তোদের চাঁড়ালের মতো রাগ। রাগ করিস না নরেন। তোর এই দুঃখের সময় তোর পাশে যে দাঁড়াতে পেরেছি এটাই তো আমার ভাগ্য রে। এমন ভাগ্যের জন্য পুণ্যি লাগে। যা মেয়েটাকে দুচোখ ভরে দেখে নে। আহারে সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা।

নরেনের মুখে কথা সরে না। ও স্তব্ধ, হতবাক। জবা হাত টেনে বলে, বাবা ঘরে চলো।

নরেন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। ওর কান্নায় আশপাশের লোকজনের চোখও ছলছল করে। হাতের উল্টো পিঠে চোখ মোছে সবাই। কেউ কেউ হরিহরকে মন্দ কথা বলে।

কাছারির গোমস্তা হয়ে বেশি বাড় বেড়েছে তোমার। আমাদের মানুষ মনে করো না।

যা যা, কথা বাড়াস না।

মার খেয়ে তো ভেজা বেড়াল হয়ে গিয়েছিলে। এখন আবার মুখ খুলছ।

আমাকে আর রাগাস না কিন্তু, নইলে–

হয়েছে থামো। জমিদারের হুকুম রেখে তুমি কোথায় নড়বে গোমস্তা মশায়।

হরিহর অন্যদিকে মুখ ফেরায়। বাড়ির সামনে গাছের নিচের মাচানের ওপর বসে ফতুয়ার বোতাম খুলে দেয়। এমন হেনস্তা ও আর কোনো দিন হয়নি। এমন জমিদারের এখানে বেশি দিন না থাকাই ভালো। ও দাঁত কিড়মিড় করে বলে, এখান থেকে কবে বিদায় হবে শালা। জমিদার তো না যেন দয়ার সাগর। যত্তসব।

বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দে ওর মেজাজ খারাপ হতে থাকে। তবু সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বসে থাকে। দাহের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে ওর যাওয়া চলবে না। সব ঠিকঠাকমতো শেষ হয়েছে, এ খবর বাড়ির বেয়ারাদের কাছে বলে তবেই ওর ছুটি। হরিহর ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে।

তখন রবীন্দ্র নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কাছারির কাজ শেষ হয়েছে। আমলারা জমা-ওয়াশিল, বাকি ইত্যাদি নিয়ে যেসব খাতাপত্র নিয়ে আসে সেগুলো দেখতে রবীন্দ্র পছন্দই করেন। কাজ নিয়ে তার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। বরং এসব খাতাপত্র জ্ঞান দেয়। এ জ্ঞান দিয়ে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা বোঝা যায়। আর এ বোঝাটা কত দরকার ছিল! তাই জমিদারির জটিল হিসাবে রবীন্দ্রর এমন গভীর মনোযোগ।

যেমন এই মুহূর্তে এই নদীটাকে বোঝা দরকার। পদ্মা ওকে অনেক দিয়েছে। দিয়েছে জীবন-দর্শনের গভীর বোধ। রবীন্দ্র পেছন ফিরে বরকন্দাজদের বলেন, তোমরা ওই দূরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

কখনো কখনো দেহরক্ষীদের উপস্থিতি একান্ত অনুভবকে আড়াল করে ফেলে। মনে হয় জনারণ্যে আছেন। এই অনুভব তাকে ক্লান্ত করে। এখন নদী তার সঙ্গী–কাছের অনুভব, অনাবিল আনন্দ। নদী এক সময় ভাঙে দুই পাড়। আবার গড়ে তোলে চর। সেই চরে মানুষ গিয়ে আশ্রয় নেয়। বসতি গড়ে।

পদ্মানদীর খেয়ালের শেষ নেই। এক সময়ের নীলকুঠিটাকে সে তার গর্ভে টেনে নিয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি মস্ত বড় নীলকুঠি। কত তার জৌলুশ ছিল। বিশাল তেতলা বাড়ি। ইংরেজরা নীলের ব্যবসা ছেড়ে চলে গেলে ঠাকুর এস্টেটের জমিদারদের দখলে এল সে বাড়ি। এক তলায় ছিল জমিদারদের কাছারি, বাকি দুতলা ব্যবহৃত হতো বসবাসের জন্য। বাড়ির চারদিকে ফল-ফুলের কী সুন্দর বাগান ছিল! কৈশোরে দেখা সেইসব দৃশ্য ভেসে ওঠে মনে। কিছুতেই ভোলার নয়। কুঠিবাড়ির দুই পাশ থেকে বয়ে গেছে পদ্মা আর গড়াই। দুই নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়ি। তেতলা থেকে দেখা পদ্মা কত গভীরভাবে আচ্ছন্ন করল রবীন্দ্রকে। এখন কোনো আনন্দ-বেদনার অনুভবে সেই নদীর ধ্বনি বিচিত্রভাবে অনুভূত হয় বুকের গভীরে। পদ্মা ক্রমাগত এগোচ্ছে–বাড়িটা নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে দেখে আগেই বাড়ি ভেঙে ইট-কাঠসহ অন্যান্য সামগ্রী সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তৈরি করা হলো নতুন কুঠিবাড়ি। একদিন গভীর রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়িটাকে নিজের কোলে নিয়ে গেল পদ্মা। এখন কত শান্ত, চুপচাপ, যেন নিরীহ সুবোধ কোনো বালিকা, উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে নিজেকে এক অন্য রকম দেশনায় গম্ভীর করে তুলে বিচিত্র প্রবাহে ধাবমান। যেন ঈশ্বর তার নাগালের মধ্যে।

রবীন্দ্র পায়চারি করেন। কখনো দাঁড়িয়ে চারদিক দেখেন। জলের দিকে এগোতে থাকেন। এ এক আশ্চর্য পৃথিবী। মাথার মধ্যে দার্শনিক চিন্তার অনুভব। কাকে লিখে জানাবে নিজের অনুভবের কথা। কথাগুলো যে এমন করে সারি বেঁধে আসছে: "আমার বোধহয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের ওপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি; চারদিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষভাবে দেখি নে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব সহকারে গাছপালা গ্রাম-নগরের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে। এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো, বাট আই গো অন ফর এভার–কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখা-প্রশাখা দিয়ে নদীর মতোই চলেছে। তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে, আর এক প্রান্ত মরণসাগরে–দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য।

মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি–কোনোকালে এর আর শেষ নেই। ওই শোন মাঠে চাষা গান গাইছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে, ঘাটে কেউ স্নান করছে, কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে। এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে, গ্রামের মধ্যে, গাছের ছায়ায়, শত শত বছর গুনগুন শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে। সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে: আই গো অন ফরএভার। দুপুরবেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো রাখাল দূর থেকে উর্ধ্বকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নৌকো ছপছপ শব্দ করে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারই ছলছল শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানা রকম অনির্দিষ্ট ধ্বনি–দুই একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুনগুন বাতাসে, বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে। তারই এক রকম কাতরসুর–সব সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান, যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বলছে, আর ভাবিস নে, আর কাঁদিস নে, আর কাড়াকাড়ি-মারামারি করিস নে, আর তর্ক-বিতর্ক রাখ, একটুখানি ভুলে থাক একটুখানি ঘুমো–বলে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করছে।

নদীর কাছ থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হয় নদীর ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে মায়ের যে বন্ধন তা ওর জীবনে কম। কখনো কি শুনেছে ঘুমানোর আগে মায়ের কণ্ঠ। মনে পড়ে না। আসলে সম্পর্কের ক্ষেত্রটা গভীরভাবে চষাই হয়নি। বাড়ির কাজের ছেলেরা দুপুরবেলা ভয় দেখিয়ে ওর চারপাশে চকখড়ির গণ্ডি টেনে দিত। বলত, ওই রেখার বাইরে বেরুলে দৈত্য এসে ধরে নিয়ে যাবে। বের হওয়ার সাহস ছিল না। জানালার শিক ধরে দেখেছে বাইরের জগৎ। সেই দেখাটা ছিল গণ্ডির ভেতরে থেকে দেখা। এখানে এসে জগৎটা বিপুল হয়ে গেছে। সেই শৈশবে গণ্ডির ভেতরে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে মাকে ডাকা হয়নি। বলা হয়নি, মা তুমি থাকতে ওরা আমাকে ভয় দেখায় কেন? মাথার পেছনে চোখ নেই–দেখা হয় না, নদীর শরীর। কিন্তু মনের চোখের সামনে কলকল করে এক পদ্মার সহস্র রূপ। জীবনকে ভরে রাখার জন্য একটি নদী অনেকখানি। ওর দিকে মুখ ফেরানোর দরকার নেই। ওটা আড়ালে থাকুক।

গা-পোড়া রোদ চারদিকে চকচক করছে। রোদ এখন নদীর মতো বইছে। ওকে আসতে দেখে বরকন্দাজেরা এগিয়ে এসে মাথার ওপর ছাতা ধরে।

বাবুমশায় আজ খুব রোদ।

আপনার মুখ লাল হয়ে গেছে।

ঘামে শরীর ভিজে গেছে।

রবীন্দ্র হো হো করে হাসতে হাসতে বলেন, রোদ উঠবে, ঝড় বইবে, নদী, পাখি, গাছ কত কিছু আমাকে ছেয়ে থাকবে। এখানে এসেই তো বুঝতে পারছি পৃথিবীটা কত বড়!

বাবুমশায় আপনি তো বিলেতে যান, পৃথিবীর কত দেশে যান, তারপরও এই পাড়াগাঁয়ের পৃথিবীটা বড়?

রবীন্দ্র ওদের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলেন, হ্যাঁ, বড়। অনেক বড়। এর সঙ্গে অন্যটার তুলনা হয় না।

বাবুমশায়ের চোখে চোখ রাখতে পারে না বরকন্দাজেরা। ওরা জানে বাবুমশায়ের দৃষ্টি ওদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। বাবুমশায় ঠিকই দেখতে পায় যে ওদের শরীরের ভেতর কতটুকু কী আছে!

২.

ভোরবেলা আনন্দী বোষ্টমীকে আসতে দেখে রবীন্দ্র পেনসিলের আঁকিবুঁকিতে নোট বইয়ের এক জায়গায় লিখলেন, ওর দুই চোখে ঈশ্বর শিলাইদহের পুরো আকাশটা নামিয়ে দিয়েছেন। আর শরীরের গড়ন? খরস্রোতা পদ্মা, বাঁকের উন্মাদনা আর জলের ঢেউয়ে অবগাহনের আনন্দের পুরো শর্ষে ক্ষেত, হাজার হাজার মৌমাছির গুঞ্জন! লেখার আঁকাবাঁকা রেখাগুলো কেটেকুটে একটা ছবি বানালেন–একজন নারীর মুখ হলো সেটা, আবার কাটতে কাটতে একটা ফুলের আকার পেল। তখন শুনতে পেলেন ডাক, গৌরসুন্দরী! ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুটো গন্ধরাজ হাতে দিয়ে বোষ্টমী বলল, আমার ঠাকুরকে দিলাম।

বেশ তো, কী সুন্দর গন্ধ আসছে।

তোমার ভালো লাগছে?

খুব ভালো লাগছে।

তুমি আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় এনে হাজির করেছ কেন? তোমাকে গাছের নিচে দেখতেই আমার ভালো লাগে।

বেশ তো এরপর তা-ই হবে। আমি বেড়াতে বের হলে তুমি এসো।

আনন্দী ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এমন প্রসন্ন ভোর ওকে আনন্দ দেয়। এমন ভোরে গৌরসুন্দরকে প্রণাম করা না হলে ওর মন খারাপ হয়। রবীন্দ্র পদ্মা নদীর মতো এই নারীকেও বুঝতে চান। এর ভেতরও পদ্মার অমিত শক্তি আছে। তখন আনন্দী বিশাল চোখের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নিজের চেহারা উদ্ভাসিত করে বলেন, গৌর, আমাকে কিছু একটা উপদেশ দাও।

রবীন্দ্রর মনে হয় এ তো বড় মুশকিলের কথা। চুপ করে এক মুহূর্ত ভেবে নেন। আনন্দী ক্ষেপে যায়। বলে, চুপ করে আছ যে?

আমি তো উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলে চুপ করে যা পাই তা নিয়েই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখছি, আমার দেখাও হচ্ছে, শোনাও হচ্ছে।

বাহ্ কী সুন্দর কথা! গৌর, আমার গৌর। ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঙ্গ দিয়ে কথা কন।

রবীন্দ্র নিজেও খুশি হয়ে বলে, চুপ করলেই সর্বাঙ্গ দিয়ে তার সেই সর্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তা শুনতেই শহর চেড়ে এখানে আসি।

আনন্দী সারা শরীরে খুশির কম্পন তুলে বলে, সেটা আমি বুঝি। তাই তো তোমার কাছে এসে বসি। তোমার কাছ থেকে প্রসাদ পেলে আমার জীবন ধন্য হয় গৌরসুন্দর।

রবীন্দ্র বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান। এখানকার প্রতিটি মানুষ ওকে প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিতে ভরিয়ে দেয়। ওই বোষ্টমী আশ্রম বানিয়েছে। ওর অনেক শিষ্য আছে। ও ফুল ভালোবাসে। কোথাও ফুল দেখলে তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধে। খঞ্জনি বাজিয়ে মাঠের আল দিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ায়। মনের মানুষের সন্ধান করে। এটাই ওর সাধনা। এসবই জেনেছে নায়েবের কাছে। রবীন্দ্রর মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আনন্দী বলে, কী দেখছো ঠাকুর?

তোমাকে।

আমাকে দেখার কী আছে। আমি পথের মানুষ।

পথের মানুষের সৌন্দর্য যে কত রকম সে কি পথের মানুষ বোঝে? বোঝে অন্যেরা। যারা দেখে।

আজ যাই।

বোষ্টমী খাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। ওর এলোচুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। হঠাৎ করে রবীন্দ্রর মনে হয়, এ বোষ্টমীর ভেতরে একজন রহস্যময়ীর বাস আছে। ওকে চেনা মুশকিল। ও ধরা দিতে আসে, কিন্তু ধরা দেয় না। ওর বুকের ভেতরে অনন্ত আকাশের বিস্তার। সিঁড়িতে কয়েক ধাপ নেমেও আবার উঠে আসে। বলে, কাল আমি তোমার প্রসাদ পেয়েছি।

রবীন্দ্র বিস্ময়ে বলেন, সে কী কথা!

বোষ্টমী হাসতে হাসতে বলে, কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া শেষ হবে সেই আশায় দরজার বাইরে বসেছিলুম। খাওয়া হয়ে গেলে চাকর যখন পাত্র নিয়ে বাইরে এল, তাতে কী ছিল আমি জানি না, কিন্তু আমি খেয়েছি।

বেশ করেছ।

ঠিক বলেছ যে বেশ করেছি। যদি তোমার প্রসাদ খেতেই না পারব, তবে তোমার কাছে আসবার তো কোনো দরকার ছিল না।

প্রসাদ তো তুমি খেলে, কিন্তু আমি কী খাই তা কি তুমি জানো?

জানার তো দরকার নেই। আমার গৌরসুন্দরই আমার কাছে সত্য। যাই গো ঠাকুর।

আনন্দী গুনগুন করতে করতে নেমে যায়। এবং আবার ফিরে আসে।

রবীন্দ্র বলেন, আবার কী হলো?

মনে হলো তুমি কী যেন বলতে চেয়েছিলে।

মনে হয়েছিল যে আমার প্রসাদ খেয়েছ জানলে তোমার ওপর তো আমার শিষ্যদের ভক্তি থাকবে না। গাঁয়ের লোকেরাও তোমাকে ভালো চোখে দেখবে না।

ও এই কথা। এ কথা তো আমি সবাইকে বলে বেড়িয়েছি। ওরা ভেবেছে, আমার এমনই দশা। আর ওদের কথায় কান দেব আমি? ওদের মুখ দিয়েছে ভগবান, ওরা তো কথা বলবেই। কিন্তু ভগবান আমাকে দিয়েছেন চাইবার শক্তি। আমি তোমাকে চাই ঠাকুর। শুধু তোমাকেই।

বোষ্টমী এবার দ্রুত পায়ে নেমে যায়। সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত তার পায়ের শব্দ শোনা যায়। রবীন্দ্র স্তব্ধ হয়ে থাকেন। লিখতে বসেছিলেন। লেখা আর হলো না। কাগজ-কলম গুটিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু অল্পক্ষণ সময় মাত্র। মাথায় আবার ভাবনা আসে। একসঙ্গে দুটো কবিতা মাথায় ভর করে।

তখন বনমালী আসে।
বাবুমশায় কুমারখালী থেকে পত্রিকাগুলো আনা হয়েছে।
দে। সম্পাদক সাহেব কেমন আছেন?
শরীরটা বেশি ভালো নেই।
আচ্ছা যা।
বনমালী কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকার কয়েকটা সংখ্যা টেবিলের ওপর রেখে চলে যায়। অনেক দিন ধরেই পত্রিকাটি পড়ার ইচ্ছা ছিল। এত দিনে সংগ্রহ করা সম্ভব হলো। তাও মাত্র চারটে সংখ্যা। কলকাতায় বসে মহর্ষি তাকে কাঙালের কথা বলেছেন, তার পত্রিকার কথা বলেছেন। বাবার কাছে এই পত্রিকার সংখ্যা আছে, হিসাবের খাতায় পত্রিকা ক্রয়ের উল্লেখ আছে। মহর্ষি বলেছেন, এমন জনদরদি মানুষটির লেখা পড়ে দেখো। তোমার জমিদারির কাজ পরিচালনায় সহায়ক হবে।
বাবামশায়, আমি তার গান শুনেই পাগল। তাকে আরও জানার বাকি।
রবীন্দ্র পত্রিকার পাতা ওল্টান। প্রজাদের নানা অসন্তোষের কথা অনবরত ছাপিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্র নিজেকেই প্রশ্ন করেন, বাবামশায় কি এসবের দিকেই নজর দিতে বলেছিলেন আমাকে? এ জন্যই কি আমাকে এখানে পাঠানো? বাবার লেখা চিঠির কথা মনে পড়ে–'এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়ালিশ, বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি-রপ্তানিপত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত মতো তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব।'
বাবার চিঠির প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট মনে আছে। মনে রাখতে হয় এবং মনে থেকেও যায়। ভেবে মজা লাগে যে বাবামশায় তাকে বালকের মতো উপদেশ দিয়েছেন। বেশ লাগে এইসব স্মৃতিচারণ। আকস্মিকভাবে চোখে পড়ে পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ওপর কাঙালের একটি লেখার অংশ। লিখেছেন, 'দ্বারিকানাথ ঠাকুর ক্যার কোম্পানিতে যুক্ত হইয়া যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুমারখালীস্থ রেশমকুটী ক্রয় করেন, তখন কোম্পানির শেষ কোষাধ্যক্ষ উইলিয়ম সাহেব ছিলেন।...পরস্পর শিষ্টাচার অনেক কথাবার্ত্তার পর, দ্বারিকানাথ বলিলেন, আমি কুটী ক্রয় করিয়াছি সত্য কিন্তু ইহা আমার নহে, নিজস্ব মনে করিয়া আপনার যত দিন ইচ্ছা ইহাতে বাস করুন।...সাহেব শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট এবং দ্বারিকানাথকে কোনো বস্তুদানে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন হাতে কিছুই ছিল না, অতএব বলিলেন, আমার স্থাপিত ও নিজস্ব বাজারটি তোমাকে দিলাম। আমি ঐ বাজার হইতে উৎপন্ন অর্থ অন্ধ, আতুর ও অনাথ বালক-বালিকাদিগকে দিয়া থাকি। দ্বারিকানাথ বাবু বলিলেন, আমিও এই সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনার কীর্তি রক্ষা করিব। কুমারখালীর বর্তমান বাজারটি এইরূপে বিনামূল্যে দ্বারিকানাথের হস্তগত হইল। তিনি আপনার কাছারি ঘুরসিয়াদপুরে গমন করিলেন। উইলিয়াম সাহেবের দান ও দ্বারিকানাথ ঠাকুরের দানে এইমাত্র ইতরবিশেষ হইল যে, সাহেব কুমারখালী প্রদেশের নিকটবর্তী অন্ধ, আতুর ও অনাথদিগকে দান করিতেন, দ্বারিকানাথ বিলাতের "ব্লাইন্ড ফান্ডে" অর্থাৎ অন্ধদিগের সাহায্যার্থ দান করিয়া আপনার যশ বিস্তৃত ও গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।'
রবীন্দ্রর মাথা ঝিম ধরে যায়। এমন তির্যক ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য তাকে মর্মাহত করে। কাগজগুলো আবার পড়বে বলে টেবিলে রেখে একতলার লাইব্রেরিতে নেমে আসেন।
আজ কলকাতা থেকে যতীন্দ্রনাথ বসুর আসার কথা। প্রসন্নকে ডেকে লাইব্রেরির বইগুলোর ধুলো ঝাড়তে বলেন। প্রসন্নর কাজের ফাঁকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে পেছন থেকে ১০ বছরের বালক পাঞ্জাবির কোনা টেনে ধরে বলে, বাবুমশায়।
রবীন্দ্র চমকে ফিরে তাকান। মনে হয় প্রচণ্ড সুরেলা কণ্ঠস্বরে কে যেন ডেকে যায়।
বালক একমুঠো শিউলি এগিয়ে দিয়ে বলে, বাবুমশায়, ফুল। আপনার জন্য কুড়িয়ে এনেছি।
বেশ করেছ। দাও।
আপনি ওদিন গাছতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ফুলের রস দিয়ে ছবি আঁকবেন। তাই এনেছি।
বাহ্, তুমি তো বেশ লক্ষ্মী ছেলে। তোমার নাম কী?
ফটিক।
সুন্দর নাম। মা বুঝি এই নামে ডাকে?
মা রেগে গেলে বলে, ফটকে।

দুষ্টুমি করো বুঝি?
ফটিকের ঠোঁটে দুষ্টুমির ফাসি। আমি আপনার ঘরে ঢুকে ওই ছবিটা দেখে আসি?
যাও। কিন্তু কোনো কিছুতে হাত দিয়ো না।
শেষ বাক্যটি শোনার আগেই ফটিক ঘরে ঢুকে যায়। ও দেয়ালে টাঙানো চুনার দুর্গের আঁকা ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। জোরে জোরেই বলে, বাহ্ কী সুন্দর! এটা কে এঁকেছে বাবুমশায়?
মস্ত মানুষ। তাঁর নাম উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
মামা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে আমি এই মানুষটাকে দেখতে যাব। আপনি ঠিকানা দেবেন তো?
রবীন্দ্র বালকের কৌতূহলে হাসতে হাসতে বলেন, হ্যাঁ, ঠিকানা দেব। আর একটা চিঠিও লিখে দেব।
যাই তাহলে।
ও ছুটে বেরিয়ে যায়। দরজায় প্রসন্নর মুখোমুখি হতেই প্রসন্ন হাত উঠিয়ে তাড়া দিয়ে বলে, ফের যদি এখানে দেখি তো বুঝবি।
কী বুঝব, হ্যাঁ, কী বুঝব। বাবুমশায় কত আদর করে কথা বললেন। আমি এক শ বার এখানে আসব।
প্রসন্ন কিছু বলার আগেই ফটিক ওকে পাশ কাটিয়ে বাগান পেরিয়ে যায়। রবীন্দ্রর মনে হয় বাগানটা পার হতে ওর কয়েকটা লাফের বেশি দরকার হয়নি। প্রসন্নকে জিজ্ঞেস করে, কার ছেলেরে?
বাবা নেই। বিধবা মা ওকে নিয়ে যন্ত্রণায় আছে। রাজ্যের যত দুষ্টুমি ওর মাথায়। ওর বাবার নাম আমার মনে নেই। চক্রবর্তীদের বাড়ি। ও হলো গিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের সর্দার।
আচ্ছা, ঠিক আছে।
রবীন্দ্র লাইব্রেরিতে ঢোকেন। শিলাইদহের একজন কাঠমিস্ত্রীকে দিয়ে নিজের পছন্দমতো কাঁঠাল কাঠের টেবিল বানিয়েছেন। বনমালী টেবিলে ফুল দিয়েছে। রক্তজবা। টকটকে লাল রঙ ঘরের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে। টেবিলে ছড়িয়ে আছে কাগজপত্র, হোমিওপ্যাথির দুটি শিশি, একটি রুপার দোয়াত, আঠার শিশি, বলপয়েন্টেড নিবের বাক্স। রবীন্দ্র দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে নিতে ভাবেন, যেমন আছে তেমন থাকুক। পেছনে তিনটি যুক্ত আয়নার মাঝখানে একটি দেশীয় মাটির ঘট। ওটার মধ্যেও ফুল দেওয়া আছে। চুনার দুর্গের ছবিটির মধ্যে দিগন্তপ্রসারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলির টান আছে। টেবিলের পাশে দুটো শ্বেতপাথরের ছোট টেবিল। টেবিলে রাখা একটি খাতায় পরিচিতজন, বন্ধুবান্ধব সবার ঠিকানা আছে। খাতাটা উঠিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের ঠিকানাটা খুঁজে কাগজ আটকে চিহ্ন দিয়ে রাখে। সত্যি যদি সেই দুরন্ত বালক ফটিক তার কাছে কোনো দিন ঠিকানার জন্য আসে। দুটি আরাম চেয়ার আছে ঘরে। ইচ্ছে হলে বিশ্রাম নেওয়া যায়, ইচ্ছে হলে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে বই পড়া যায়। আছে মোটা গদিআঁট ডিভান, তার ওপর আছে ছোট-বড় তাকিয়া। পেছনের আলমারিতে কিছু বই। বাম পাশে একটি সোফা মেঝেতে পাতা হয়েছে মুলতানি গালিচা। দেশি-বিদেশি বন্ধুরা এলে এখানে গল্পগুজব হয়, সাহিত্য আলোচনা হয়। বেশ চলছে জীবন। বাইরের অবারিত প্রকৃতির পাশাপাশি ঘরের এই পোশাকি মেজাজ ভিন্ন অনুভব দেয়। মাথার মধ্যে সারাক্ষণ ধরে রাখা লেখার উপাদানগুলো প্রস্ফুটিত হয় সমানভাবে। একটার সঙ্গে অন্যটার বিরোধ নেই। একটা বই পড়ার, চিন্তার করার আগেই গানের কয়েকটা লাইন মাথায় আসে। দ্রুত টেবিলে এসে লিখে ফেলি:
জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হলো ধন্য হলো মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন,
তোমার যাকে দিয়েছ ভরে
বাজাই আমি বাঁশি–
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি,
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি?
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব

এ মোর নিবেদন।
লিখে দুবার পড়ে ভীষণ খুশি হয়ে ভাবেন, এটুকুর জন্যই সারা সকাল মাথা কাজ করেছে। প্রবল সৃস্তি নিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পান যে যতীন্দ্রনাথ আসছে। রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। যতীন্দ্র তার উজ্জ্বল হাসিমুখ দেখে দ্রুতপায়ে বারান্দায় উঠে আসে।
এই যে, তুমি কাল আসবে মনে করেছিলুম। তা তোমার দেরি হলো কেন? এসো।
যতীন্দ্র ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, রাত শেষে কুষ্টিয়া স্টেশনে নেমে ঘাটে আসি। দেখলাম আমার সামনে বৈশাখের ক্ষীণাঙ্গী গড়াই বয়ে যাচ্ছে। ঘাটে স্টিমার বাঁধা ছিল। দেখলাম চিমনি দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে।
চা খাবে?
আগে চান করব।
তাহলে বোস। বিপিনকে জল তুলে দিতে বলি। হ্যাঁ, বলো। আমার এলাকায় তোমার অভিজ্ঞতার কথা শুনি।
দেখলাম খাটের ওপর স্টেশন ঘর। টিকিট কিনতে হবে। সেখানে গিয়ে দেখলুম কেউ নেই। শেষে স্টিমারের সামনের ডেকে একটি বেতের চেয়ারে বসে পড়লুম। তন্দ্রার মতো এসেছিল। একসময় স্টিমারের বংশীধ্বনির ভৈরব রবে চমকিত হয়ে জেগে উঠলুম।
হা-হা করে হেসে ওঠে যতীন্দ্র।
রবীন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, তোমাকে এমন কবিতায় পেয়ে বসেছে দেখে আমার ভীষণ আনন্দ লাগছে।
কিন্তু পরে যখন জানলুম যে ওই বংশীধ্বনি যাত্রীদের টিকিট ক্রয়ের আহ্বান তখন ভীষণ হতাশ হয়ে গেলুম। আবার গিয়ে টিকিটঘরের দরজার দাঁড়ালুম। বিরক্ত লাগছিল। পরে একজন খালাসির সাহায্যে আমার টিকিট কাটা হলো।
অভিজ্ঞতাটা ভালোই অর্জন হয়েছে। তাই না?
হ্যাঁ, খুব ভালো। স্টিমারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখলুম। পুব আকাশ লাল করে সূর্যমশায় একটু একটু করে আলো বিকীরণ করছেন। মনে হচ্ছিল এই দৃশ্য দেখে–
জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। তাই তো?
হ্যাঁ, এক রকম তা-ই। দিনের প্রথম আলোয় নদী তীরের বালুরাশি আর তার পেছনে গ্রামের বৃক্ষরাজি অস্পষ্ট রেখায় ছবির মতো লাগছিল। কিনারায় রেলপথে মালের গাড়ি হুস হুস শব্দে চলে গেল। দুজন খালাসি স্টিমারের বাঁধন খুলে ছিল। তারপর গড়াইয়ের জলে সাঁতার কেটে ছুটল বাষ্পীয় তরণী। কেমন হলো আমার বর্ণনা?
সে আর বলতে, বেশ ভালো করে আমার এলাকা দেখা হয়েছে তোমার। আর কী দেখলে?
জল শুকিয়ে গিয়ে নদীতে চড়া পড়েছে। স্টিমার চড়া ঘুরে ঘুরে চলছিল। নদীর ধারে কলসকাঁখে দাঁড়িয়ে দুজন স্ত্রীলোক স্টিমার দেখছিল। দেড় ঘণ্টা পরে শিলাইদহ ঘাটে এসে পৌঁছি। প্রভাত আলোয় দূরে পদ্মা এবং আকাশে মেঘের গায়ে বন বৈচিত্র্য যে শোভা দেখেছি তা আর বর্ণনা করতে পারব না।
যেটুকু করেছ তাতেই আমি ধন্য। ধন্য আমার শিলাইদহ। আমি তো চাই যে আমার অতিথিরা এখানে এসে দিব্যদৃষ্টি লাভ করবে।
যতীন্দ্র মৃদু হাসে।
বিপিন এসে বলে, বাবু জল দিয়েছি।
যাও, চান করে এসো। তারপর পেটপুরে খেয়ে ঘুম দাও। সব অবসাদ দূর হয়ে যাবে।
বৌদি-ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?
ভালো আছে। ওদের কিছুকালের জন্য এখানে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করছি। সেই যে একবার এসে কয়েক মাস বোটে থেকে গেল, তারপরে আর ওদের আসা হয়নি।
ভালোই হবে। আপনার সময়–
যাও, যাও চান সেরে এসো।
যতীন্দ্র আর দাঁড়ায় না। আগে নিজের জন্য ঠিক করে রাখা ঘরে যায়। তারপর কলঘরে।
রবীন্দ্র সদ্য লেখা গানের সুর ভাঁজেন। আরাম চেয়ারে মগ্ন হয়ে দুচোখ বুজে সুরের মায়াজাল তৈরি হতে থাকে মগজের কোষে।
একটু পরে বনমালী এসে খবর দেয়, বাবুমশায় সেই জেলেটি এসেছে ওর মেয়েকে নিয়ে। আপনি ওকে আসতে বলেছিলেন।
এখানে নিয়ে আয়।

মেয়েটি আবার ওর বাছুর গরুটা সঙ্গে করে এসেছে। সারা দিন মাঠে-ঘাটে ঘুরে ও গরু চরায়।
আচ্ছা ঠিক আছে আমি বের হচ্ছি। ওদের সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে ঘুরেও আসব।
মেয়েকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল হরেক। রবীন্দ্রকে এগিয়ে আসতে দেখে বাবা-মেয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। আবার মাথা উঠিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে, হুজুর।
কেমন আছিস তোরা? কী হয়েছে?
আমার মেয়েটাকে নিয়ে জ্বালায় পড়েছি হুজুর। এক্কেবারে কথা শোনে না। বড় হয়েছে তবু গরু নিয়ে মাঠে ঘুরবে। ওর ভয় ওর গরুটা যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়! আমার মায়ের গাইটাকে লাল সাহেব ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বিধবা মা আমার সেই শোকে বিছানা নিয়েছিল। আর ওঠেনি।
হরেকের কথা শুনে চমকে ওঠেন রবীন্দ্র। মনে পড়ে কাঙাল হরিনাথ তার গ্রামবার্তা প্রশিকায় এক গরু চোর ম্যাজিস্ট্রেট বলে সংবাদ ছাপিয়েছিল। ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুমারখালী পরিদর্শনে এসে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। আশ্চর্য, এভাবে তার নাতনির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে! আর সেই দুঃসাহসী সম্পাদকের দেখা হয়নি। এখন অসুস্থ। সঙ্গে অনেক লড়াই করে এগিয়ে দিয়েছে সমাজকে। তার লেখার ধারে জমিদারেরা যেমন তেমনি প্রশাসক ইংরেজরাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আচরণে সংযত হয়েছে।
বাবুমশায়।
হরেকের ডাকে রবীন্দ্র ভুরু উঁচু করেন। কিশোরী মেয়েটি বাবার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।
বাবুমশায়, আপনি আমার মেয়ের একটা উপায় করে দেবেন।
হরেক হাত কচলায়। মেয়েটি বাবাকে আঁকড়ে ধরে গলা বাড়িয়ে জমিদারকে দেখে। জমিদার স্নেহের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে, কী নাম তোর! গরু চরাতে বুঝি খুব ভালো লাগে?
কিশোরী কথা বলে না। হরেক আগ বাড়িয়ে বলে, হুজুর ও আমার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। মা আমার গাইয়ের সেবা করে দিন কাটিয়েছে। দুধ বেচে সংসার চালিয়েছে হুজুর।
রবীন্দ্র চুপ করে থেকে বলে, তোর মেয়েটি ভারি সুন্দর!
ও তো কালো হুজুর। এই কালো মেয়েটা আমার জ্বালা।
তুই বাড়ি যা হরেক। আমাকে একটু ভাবতে দে।
আচ্ছা হুজুর।
তোর মেয়ের নাম কী রে?
কলি। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে হরেকের মুখ। মেয়েটা খুব লক্ষ্মী হুজুর। যে সংসারে যাবে সে সংসার ভরিয়ে রাখবে। ভালো রাঁধতে পারে।
ঠিক আছে একদিন তোর মেয়ের রান্না খাব। কী রে কলি, আমাকে রান্না করে খাওয়াবি না?
মেয়েটি খিলখিল হাসিতে দিগদ্বিক মাতিয়ে দিয়ে গাই বাছুরটাকে তাড়া করে দৌড়ে পালায়। ঘন চুলের দুটো মোটা বেণী পিঠের ওপর লোটায়। মেয়েটির টানা দুটো চোখের দৃষ্টি অপূর্ব। ওর স্নিগ্ধ লাবণ্য কী যে মায়াময়! গাঁয়ের মানুষ ওর গায়ের রঙ দিয়ে বিচার করছে ওকে। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রর ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। তার হাতে প্রায়ই ক্ষুদ্র একটি লাল খাতা থাকে। তাতে ইচ্ছেমতো নোট করেন। ছোট লেখা হলে পুরোটাই লিখে ফেলে। ঘড়ির চেনের সঙ্গে আটকানো থাকে সোনার পেন্সিল। আজও খাতাটা খুলে সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলেন:
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে।
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্ত বেণী পিঠের পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
এটুকু লিখে খাতাটা বন্ধ করে পকেটে রেখে ভাবেন, বাকিটা নদীর ধারে বসে লেখা হবে।
বাবুমশায়। উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত হরেকের কণ্ঠ। ওতো বুঝতে পারেনি যে মেয়েটাকে দেখে বাবুমশায়ের মনে কী ভাবের উদয় হয়েছিল। বরকন্দাজ বিরক্তির সঙ্গে বলে, দেখছিস না বাবুমশায় লিখছেন। তোকে না বাড়ি যেতে বলেছেন

হুজুর।
হরেক বরকন্দাজের দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকায়। চোখও গরম করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। রবীন্দ্র ওর দিকে ঘুরে বলে, তুই আজ মাছ ধরতে যাসনি হরেক?
যাইনি। মেয়ের মা আমাকে–
বুঝেছি, বুঝেছি, মেয়ের বাপের চেয়ে মেয়ের মাই বেশি বিপদে পড়েছে। ঠিক আছে আয় আমার সঙ্গে। নদীর ধারে যাই। হ্যাঁরে তোর মায়ের গরুটা ম্যাজিস্ট্রেট কবে নিয়ে গিয়েছিল?
বছর বিশেক হবে হুজুর। হঠাৎ করে ও উৎসাহিত হয়ে বলে, কুমারখালীর সম্পাদক মশায় ব্যাটাকে গরুচোর বলে কাগজে লিখে দিয়েছিল। সেই খবর ছাপার পর রোল উঠেছিল গাঁয়ে। এরপর হরেক নিঃশ্বাস ফেলে হলে, মা আমার সেই কষ্ট ভুলতে পারল না।
রবীন্দ্রর কণ্ঠ থেকে একটি শব্দই বের হয়, হুঁ।
তিনি হাঁটতে থাকেন নদীর দিকে। বুকটা ভার হয়ে যায়। এসব ঘটনা শুনলে অপরাধে ভরে ওঠে বুক। পিতা, পিতামহ, তারও আগে যারা ছিল তাদের অপকর্মের দায় এড়াবে কীভাবে? ঠাকুর-এস্টেটে এমন ঘটনা ঘটলে তার দায় তো ঠাকুরদের ওপরই আসে। নিজের এমন অনুতাপের রেশ কণ্ঠ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, হরেক আজ তুই যা। তোর মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা আমি করে দেব।
যে আজ্ঞে, হরেক থমকে থেকে হাত কচলায়। ঘাড়ের গামছা টেনে চোখ মোছে। বাবুমশায় অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার পরও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে বলে, আমার মেয়েটার ভালো বিয়ে হলে বুঝব আমার মায়ের পুণ্যের ফল। তখন ও শুনতে পায় বোষ্টমী সর্বক্ষেপীর গলা। অনেক দূর থেকে গান গাইতে গাইতে আসছে। কী যে জাদুর মায়া আছে তার গলায়। কাঙালের গান গাইছে সে:
দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে।
হরেক কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে। কেন ও নিজেও বুঝতে পারে না।
রবীন্দ্রর কানে সে কান্না পৌঁছায় নিজের গানের মন্দ্রিত সুরের মতো। তিনি কান পেতে থাকেন। কান্নার ধ্বনি দূর থেকে দূরে চলে যায়–শুধু জেগে থাকে জীবন, মাটি, প্রকৃতি এবং মানুষ–নিরন্ন, অভাবি, দুঃখভরা জীবনের কাঁটা নিয়ে বেঁচে থাকা হাজার হাজার মানুষ। বুকের ভেতরের প্রবল অস্বস্তি তাড়াতে পারেন না। ভাবেন, এদের এই জীবনের দায় থেকে নিজেকে বাইরে রাখতে পারবেন কি? শুধু কি কবিতা লিখলেই হবে, নাকি আরও কিছু করার আছে?
আবার 'কৃষ্ণকলি' মাথায় ভর করে। লাল খাতাটা বের করে লিখতে থাকেন:
ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হতে এস্ত এলো তাই।
আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।
ছোট খাতাটা আবার পকেটে রাখতে হয়। ঘাটের কাছে বালকদের হৈ-হল্লা। ওরা একটা মস্ত শাল কাঠ ঠেলে নদীতে নামানোর চেষ্টা করছে। ওটা হয়তো কেউ রেখেছে মাস্তুল বানানোর জন্য। ফটিক ছুটে এসে রবীন্দ্রর পাঞ্জাবির কোনা টেনে ধরে, বাবুমশায় আমরা খেলছি। আপনি আমাদের খেলা দেখবেন?
দেখব রে, দেখব। কিন্তু তোরা তো বড় কঠিন খেলা খেলছিস। ওই কাঠ নড়ানোর সাধ্য কি তোদের হবে?
হবে, হবে বাবুমশায়।
বলতে বলতে ফটিক দৌড়ে চলে যায়। অন্য ছেলেরা তখন চেঁচিয়ে বলছে, মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। কিন্তু কাঠের গুঁড়ি নড়ে না। অন্য একটি ছোট বালক এক লাফে গুঁড়ির ওপর উঠে বসে। অন্যরা হইহই করে ওঠে, এই মাখন নাম, নাম বলছি।
মাখন ওদের কথা কানে তোলে না। গ্যাট হয়ে বসে থাকে। ছেলেরা তার এই উদাসীন ভাব দেখে বিমর্ষ হয়ে যায়।

একজন গিয়ে ওকে ঠেলা দেয়। কিন্তু মাখন বিচলিত হয় না। ফটিক আস্ফালন করে বলে, দেখ মার খাবি! এই বেলা ওঠ।
মাখনের দখলদারি মনোভাব বড়ভাইয়ের আস্ফালনে একটুও নড়ে না। ছেলেরা তখন মাখনকেসহ গুঁড়িটা ঠেলতে শুরু করলে ঝাঁকুনির ধাক্কায় সে মাটিতে পড়ে যায়। ছেলেরা হাততালি দিয়ে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু ফটিকের রেহাই ছিল না। মাখন ভাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর নাকে-মুখে আঁচড় কেটে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে চলে যায়। ভেঙে যায় খেলা।
ফটিক কয়েকটা কাশ ছিঁড়ে নদীতে অর্ধেক নিমজ্জিত একটি নৌকার গলুইয়ের ওপর বসে, তারপর চুপচাপ কাশের গোড়া চিবাতে থাকে। এ সময় বাঘা বাগদি এসে বলে, ফটিক দাদা, মা ডাকছেন।
এখন যাব না! তুমি যাও।
মা তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।
আমি এখন যাব না। মাখন গিয়ে মাকে নালিশ দিয়েছে। জানি তো বাড়ি গেলে মা আমাকে পেটাবে।
এতই যদি মার খাওয়ার ভয় তাহলে দুষ্টুমি করো কেন?
আমি করেছি নাকি, মাখনই তো করল।
চলো, বাড়ি চলো।
তুমি যাও, আমি আসছি।
বাঘা বাগদি চলে যায়। নদীন ধারে হাঁটতে হাঁটতে সবটাই রবীন্দ্রর চোখে পড়ে। দূরে দাঁড়িয়ে, কাছে থেকে সবটাই দেখা হয়েছে। ফটিকের সরল চেহারা তার মনে গেঁথে গেলে ছোট লাল খাতার পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে লিখে রাখে 'ফটিক'। ওর বিমর্ষ চেহারা দেখে মায়া হয়। দুরন্ত বালকের ঝিমিয়ে যাওয়া দেখতে ভালো লাগছে না। দুপা এগিয়ে গিয়ে বলেন, ফটিক, আমার কাছে আয়।
আদরের ডাক শুনে ফটিক এক লাফে বাবুমশায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। রবীন্দ্র ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, মিষ্টি খাবি, না দই?
দুটোই খাব। সরল হাসিতে উদ্ভাসিত নিষ্পাপ বালকের অপরূপ চেহারা দেখে মুগ্ধ হন রবীন্দ্র। ছেলেটার ঘাড়ে হাত রেখে ওকে কাছে টেনে হাঁটতে থাকেন। ফটিক দেখতে পায় উল্টোদিক থেকে ওর মামা বিশ্বম্ভর আসছেন।
বাবুমশায় ওই যে আমার মামা আসছে। মামার সঙ্গে আমি কলকাতায় যাব।
বিশ্বম্ভর এগিয়ে এসে বলেন, নমস্কার জমিদারমশায়।
শুনলুম আপনি ফটিককে কলকাতায় নিয়ে যাবেন?
ঠিকই শুনেছেন। ও ভীষণ দুষ্টু। ওর দুষ্টুমির যন্ত্রণায় আমার বোনটি অস্থির। বাবা নেই তো, সেজন্য বখে গেছে।
ও বখে যাওয়া বালক নয় বিশ্বম্ভরবাবু। গম্ভীর কণ্ঠে কথাটি বলেন রবীন্দ্র।
আমি দীর্ঘদিন পশ্চিমে কাজ করেছি। বোনটার খোঁজখবর নিতে পারিনি। বহুকাল পরে দেশে ফিরে দেখলাম বোনটা দুরবস্থায় আছে। তাই ভাবলাম একটা ছেলেকে আমি নিয়ে গেলে বোনটা কিছু শান্তিতে থাকবে। আমি ওকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করে দেব।
এই বালক এখানকার প্রকৃতিকে যেভাবে চিনেছে আমার সন্দেহ হয় কলকাতার ইট-পাথরের মধ্যে ও থাকতে পারবে কি না।
বিশ্বম্ভর কড়া গলায় বলে, থাকতে ওকে হবে। শাসন করলে ঠিকই থাকবে। তুই বাড়ি যা ফটিক।
ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। একটু পরে যাবে।
রবীন্দ্র আর দাঁড়ান না। কুঠিতে ফিরে বনমালীকে বলেন ফটিককে দই-মিষ্টি খাওয়াতে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে লাল খাতায় ফটিকের নামের নিচে লেখেন 'বিশ্বম্ভর'। পুরো ঘটনাটাই গল্পের আদলে মাথায় ফুটতে থাকে। একই সঙ্গে আবার 'কৃষ্ণকলি' ফিরে আসে চিন্তায়:
পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে,
আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।

কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।
এটুকু লিখতেই ফটিক এসে টপ করে পায়ে প্রণাম করে, যাই বাবুমশায়।
আয়।
ও একছুটে বাড়ির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে যায়।
কাছারিতে নায়েব এসেছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন। আজ আর খাতাপত্রের হিসাবে মন নেই। দরজায় দাঁড়িয়ে নায়েবকে বলেন, অহীন্দ্র, হরেকের মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। একটা ভালো ছেলে দেখ।
জে আজ্ঞে।
দরজা ছেড়ে খানিকটুকু এগোলে পেছন থেকে শুনতে পায়, কৈবর্তের মেয়ে তারও বিয়ের ব্যবস্থা করবে জমিদার! শুনে হাসি পায় রবীন্দ্রর। মানুষ পরিবর্তন মানতে পারে না। পরিবর্তন দেখলে আঁতকে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে সইয়ে নেয়। এর মধ্যেও কেউ কেউ গর্জে ওঠে পরিবর্তনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য–কাঙাল যেমন দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করছে সমাজের জন্য।
'কৃষ্ণকলি'র শেষের কয়েকটি লাইন গুনগুন করতে করতে লাইব্রেরিতে ঢোকেন রবীন্দ্র। যতীন্দ্রনাথ বসু স্নান সেরে, জলপানি খেয়ে আবার লাইব্রেরিতে এসে কাগজ পড়ছে। রবীন্দ্রকে দেখে হাসিমুখে বলে, অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলেন বুঝি?
শুধু কি বেড়াই? একইসঙ্গে মানুষ দেখি। লেখার রসদ সংগ্রহ হয়। ভাবনাগুলো দিগ্বিদিক ছোটে। সেসব খাতায় ওঠাই। কাজ তো এক রকম নয়, হাজার রকম!
যতীন্দ্রর জিজ্ঞাসা, আপনি কি এই ঘরে বসেই লেখেন?
প্রায়ই। তবে ওপরের বারান্দায় বসলে শিলাইদহের সৌন্দর্যে আনন্দ বেশি পাই।
আপনি কোন সময় লেখেন?
যখন মনে হয়, তখন খুব লিখে যাই।
আপনার এই ক্ষুদ্র লাল খাতা আর সোনার পেন্সিলটি দারুণ সুন্দর।
এ দুটো আমার সঙ্গী। মৃদু হাসেন রবীন্দ্র। এই কিছুক্ষণ আগেও এই খাতায় 'কৃষ্ণকলি' কেমন জলের বেগে বয়ে গেল। এই তো সৃষ্টির রহস্য। এই রহস্যের মধ্যে ঢুকে গেছে দুরন্ত বালক ফটিক। কোনো এক অজানার উদ্দেশে তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু হবে।
নায়েব ও কাছারির সুপারিনটেনডেন্ট এসে দাঁড়ান।
বাবুমশায়, খাজাঞ্চিমশায়ের শরীরটা খুবই খারাপ।
হোমিওপ্যাথি চলছে তো। ডোজ বাড়িয়ে দাও। দুদিন দেখ। তারপরও উপকার না হলে ওষুধ বদলে দেব!
জে আজ্ঞে। দুজনে একই সঙ্গে মাথা নাড়ে।
আর শোনো, চিকিৎসালয় থেকে কুইনাইন ফ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা করো। গাঁয়ের কেউ যেন ম্যালেরিয়ায় মারা না যায়। আর কেউ যেন কুইনাইন নিতে এসে খালি হাতে ফিরে না যায়।
জে আজ্ঞে। আমি সব ব্যবস্থা করব।
দুজনে চলে যেতেই রবীন্দ্র পেছন থেকে নায়েবকে ডাকেন।
শোনো, যোগেনের ব্যাপারটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে হবে। গরিব মানুষ, তার অসুবিধা কোরো না। মোকদ্দমায় কাজ নেই, যা করলে হয়, তেমন একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ো।
জে আজ্ঞে।
চলে যায় দুজনে। রবীন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, আমার এসব কথা শুনলে নায়েব-আমলারা খুশি হয় না। এ জন্য ওদের যত রাগ আমার ওপর। নানা কিছু নানাভাবে সামলাতে হয়।
যতীন্দ্র বিস্ময় বোধ করে। এত কিছু একজন কবি কি করতে পারে? কিন্তু করছেন এবং চলছে।
মহর্ষির নামে আপনি না দাতব্য চিকিৎসালয় করেছেন?
হ্যাঁ, বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাব? দেখবে গরিব মানুষের চিকিৎসার কী ব্যবস্থা হয়েছে। শচীন্দ্রকে বলেছি ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি করতে। মানুষকে সচেতন করলে মশার উপদ্রব কমবে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও কমবে।
কলকাতার খবর কী? গতবারের কথা ঠিক করে বলতে পারি না, তবে এবার যে সত্য সত্যই প্লেগ হয়েছে তাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

যতীন্দ্র হাসতে হাসতে বলে, প্রতি বছর যারা মরে, তারাই মরছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই।
রবীন্দ্র চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলেন, এ সত্য এখানে এসে আমি আরও গভীরভাবে বুঝতে পারছি।
ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আসে। প্রসন্ন এক গ্লাস লেবুর শরবত এনে দেয়। চোখে চশমা লাগিয়ে একটানে শরবত খেয়ে ফেলে। যতীন্দ্র বলে, তোমার বাবুমশায়কে চা দিলে না?
বাবুমশায় চা খান না। আপনাকে দেব?
দাও। দুটো মিষ্টিও দিও। স্বাদেই টের পেয়েছি খাঁটি দুধের মিষ্টি।
আরও দু-চার দিন থেকে যাও। তুমি তো কালই যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছ।
আমাকে যেতেই হবে। কাজ আছে। আচ্ছা বোশেখের পদ্মা তো দেখলুম। বর্ষাকালে পদ্মার চেহারা কী হয়?
ওহ, সে কী ভীষণ! পাবনার ঘাট থেকে শিলাইদহের ঘাট পর্যন্ত অনন্ত জলরাশি। আর সে অবিশ্রান্ত ভীমগর্জন এখানে বসে শোনা যায়। আমি পদ্মার সকল মূর্তি দেখেছি। আমার ভয় করে না।
যতীন্দ্র হাঁ-করে কথা শুনে বুঝতে পারে, পদ্মার কথা বলতে গেলে তাদের ঠাকুরমশায় আবেগ ধরে রাখতে পারেন না। এখানকার সবকিছু মানুষটির ভেতরে তোলপাড় করে–তাকে জ্ঞান দেয় এবং স্বপ্নের দরজা খুলে দেয়। এভাবে তিনি এখানকার প্রাণটুকু ধরে কলকাতার জীবন থেকে দূরে থেকেও বেশ নির্বিঘ্নে দিনযাপন করছেন। মানুষটি যেখানে যাক সেখান থেকে গ্রহণ করার শক্তি তার অনিঃশেষ।
গগন হরকরা একগাদা চিঠি এনে বলে, বাবুমশায় চিঠি।
প্রথম চিঠিটা খুলে পড়ে যতীন্দ্রকে বলেন, আমার মুদ্রাকরের লেখা চিঠি। এবার আমি অনেক কবিতা থলি-ঝাড়া করেছি। একটি ক্ষুদ্র পুস্তক বেশ ভালো করে ছাপাচ্ছি, নাম ক্ষণিকা। আজ এতটা সময় ধরে একটি কবিতা মাথায় ঠাঁই বসে আছে। লিখেও ভালো লেগেছে। এখন একটি স্তবক মাথায় এসেছে। শোনো।
রবীন্দ্র গুনগুন করে বলতে থাকেন:
এমনি করে কাজল কালো মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে
এমনি করে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে
কালো তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
বাহ্, সুন্দর।
বলছো সুন্দর, তারপরও চলে যাবে কাল ভোরে।
আপনার তো অতিথির শেষ নেই। আপ্যায়নেও ত্রুটি নেই। আমরা যদি দলবলে বেশি হয়ে যাই আপনার লেখার ক্ষতি হবে। আমরা চাই না লেখার ক্ষতি হোক।
আমার মোটেই ক্ষতি হয় না। লেখা নিয়েই তো থাকি। কোনো ভাবনাই আমার মাথা থেকে সরে যায় না। গেলে অন্য কাজ করতেই পারতুম না।
সেজন্যই এত লেখা হয়। রহস্যটা বুঝতে পারলুম।
হা, হা করে হাসেন রবীন্দ্র। ছোটগল্প লেখার জন্য এখন নানা ছক দানা বেঁধে উঠছে। এইসব মানুষের জীবনের ছোট ছোট কথা, ছোট আকারে বলতে হবে।
বুঝে গেছি যে ছোটগল্পের বড় ভাণ্ডার আপনার হাতে গড়ে উঠবে। আমি যাই, গ্রামটা ঘুরে আসি।
যতীন্দ্র বেরিয়ে গেলে রবীন্দ্র দোতলায় ওঠেন। মৃণালিনীকে চিঠি লিখতে হবে। কলকাতা যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন। বাচ্চাগুলোকে দেখার জন্যই বেশি তাড়না বোধ হয়। বারান্দায় বসে চিঠি লিখতে থাকেন: 'ভাই ছোটবউ, যেমনি গাল দিয়েছি অমনি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভালমানষির কাল নয়। কাকুতি মিনতি করলেই অমনি নিজমূর্তি ধারণ করেন আর দুটো গালমন্দ দিলেই একেবারে জল। একে তো বলে বাঙাল। ছিঃ ছিঃ ছেলেটাকে পর্যন্ত বাঙাল করে তুল্লে গো। বলি খোকার জন্য এক একবার মনটা ভারি অস্থির বোধহয়। বিলিকে আমার নাম করে দুটো 'অড' খেতে দিয়ো। আমি না থাকলে সে বেচারা তো নানা রকম জিনিস খেতে পায় না। খোকাকেও কোনো রকম করে মনে করিয়ে দিয়ো। আমার পশমের ছবি দেখে সে আমাকে চিনতে পারে এ শুনে

আমি বড় খুশি হলুম না।' আরও অনেক কিছু লেখার আছে মৃণালিনীকে, কিন্তু লেখা হলো না। বনমালী এসে কাচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়ায়–

বাবুমশায়।

রবীন্দ্র চোখ তুলে তাকাতেই বলে, নিচে মৌলবি এসেছেন।

বসতে বল, আসছি।

লেখার কাগজপত্র গুটিয়ে নিচে নামলে মৌলবি চুপিচুপি কণ্ঠে বললেন, কলকাতার ভজিয়া এসেছে।

ভজিয়া! রবীন্দ্র বিরক্ত হন। মৌলবিকে ভর্ৎসনার সুরে বলেন, মৌলবি তুমি আমাকে বড্ড জ্বালাতন করো। ভজিয়ার কথা শোনার সময় আমার নেই। তুমি সামলাও ভজিয়াকে।

হুজুর ও আপনার কাছে ওর কথা বলতে চায়। আমার কাছে কি ও আর কথা বলবে?

রবীন্দ্র বুঝতে পারেন মৌলবি মেয়েটির পক্ষে ওকালতি করছে। ভজিয়ার মতো মৌলবিও পশ্চিমের কোনো দেশ থেকে এসে শিলাইদহে থাকছে। ও এই এলাকার আদিবাসী নয়। কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে তার খাতির। প্রায়ই এক দঙ্গল প্রজা নিয়ে কাছারিতে এসে হাজির হয়। মৌলবি আবার বিনীত স্বরে বলেন, ওর কথাটা শুনুন, তারপর বিদায় করে দিন। মেয়েটা কলকাতা থেকে এসেছে।

আচ্ছা ডাকো।

রবীন্দ্র নিজের রাজচৌকিতে গম্ভীর হয়ে বসেন। মেয়েটি ঘরে ঢুকেই পা জড়িয়ে ধরে। তারপর চোখের জলে-নাকের জলে এক হয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বিস্তর অসংলগ্ন কথা বলতে থাকে। মা-মেয়ের ঝগড়া বিষয়ে কথা। রবীন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, মা-মেয়ে দুজনেই আমাদের পশ্চিম আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা, কেউ হৃদয়ের কোমলতার জন্য প্রসিদ্ধ নয়। মৌলবি হাসতে পারেন না। চুপ থেকে ভজিয়ার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন। ভজিয়ার প্রতি তার নিজ দেশীয় টান আছে। তাকে সাহায্য করার দায় আছে। রবীন্দ্রর রসিকতা করে বলা কথা গায়ে মাখেন না তিনি। ভজিয়া তখনো বলে যাচ্ছে, এই তো সেদিন সন্ধ্যেবেলা মায়ের সঙ্গে প্রথমে শুরু হলো মুখোমুখি ঝগড়া, তারপর হাতাহাতি বেধে গেল।

বুঝতে পেরেছি, তোমাদের মধ্যে প্রথমে হওয়া উচিত ছিল স্নেহের আলাপ, তারপর আলিঙ্গন, সেটা না হয়ে হলো গালাগালি থেকে মারামারি।

ভজিয়া প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, তাই। মারামারি করতে গিয়ে মা পড়ে গেল। ব্যথাও পেল। মা একটা কাঁসার বাটি নিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে গিয়েছিল, নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে আমার হাতের বালা মায়ের মাথায় লেগে রক্তপাত হয়।

ঘটনাটা কবে ঘটালি?

তিন-চার দিন হলো।

তো এখন কী হয়েছে? এখানে এসেছিস কেন?

মাইজি বলেছে আমাকে আর তেতলায় কাজ করতে হবে না। আমাকে একতলায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

বেশ করেছে, ভালো করেছে।

বুঝলে মৌলবি ওর এখানে আসা দেখে আমার কত যে আশঙ্কা হয়েছিল। ভয়ে সিঁটিয়ে উঠেছিলুম। আর ও ঘটনা ঘটিয়েছে নিজের মায়ের সঙ্গে। কালই ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও। আর শোনো ভজিয়া, তোর মাইজি যা হুকুম দিয়েছে সেটাই হবে। আমি এখানে বসে কিছু করতে পারব না।

আমি তিনতলায় কাজ করব।

সে আমি কলকাতায় গিয়ে বুঝব। এখন যা।

ভজিয়া কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়। রবীন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ বসে থাকেন। ভাবেন ভজিয়াদের মতো কাজের মানুষের সমস্যা এতদূর প্রান্তে তার কাছে এসে গড়ায়। হায় ঈশ্বর, পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কেন, মানুষ কি আমার কাছেই আসবে?

আসুক। আমি মানুষের সঙ্গ চাই। ওদের ভালোবাসা দিতে চাই। ভাবতে ভাবতে আবার ওপরে উঠে যান তিনি। মানুষের এত কিছুর মধ্যে থাকাটা জীবনযুদ্ধের একটা বড় অংশ। ওপরে উঠে আবার মৃণালিনীকে লিখতে বসেন, কিন্তু লেখা হয় না। মৃণাল যখন এখানে এসেছিল সে ঘটনাটা বারবার মনে পড়ে। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ এবং পরিশেষে নাটকীয় যবনিকার পরে বেশ লেগেছিল পুরো ব্যাপারটা।

সেবার মৃণালিনী তার বান্ধবীসহ এসেছিল শিলাইদহে। বলেন্দ্রনাথ ওর কাকীমাকে বলল, পদ্মার চরের বালিহাঁসের উড়াউড়ি এবং পদ্মার সৌন্দর্যের বাহারটা দেখতে হলে শুধুই বোটে বসে থাকলে হবে না কাকীমা। ঘুরতে হবে।

মৃণালিনী আর তার সহচারী সোৎসাহে বলেছিল, আমরা বের হব। আজ বিকেলেই।

শিলাইদহের অপর পারে চরের কাছে বোট লাগানো ছিল। প্রকাণ্ড চর, ধু ধু করে; চরের শেষ দেখা যায় না। মাঝে পাবেন এক এক জায়গায় নদীর ক্ষীণ স্রোত গড়িয়ে যায়, যেন রুপালি ফিতা। আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভুল হয়। আশপাশে গ্রাম নেই, গাছ নেই, মানুষজন নেই। সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে বের হয় জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, কোথাও শুকনো সাদা বালি। পুবদিকে তাকালে দেখা যায়, 'উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য–নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা।' পশ্চিমে মুখ ফেরালে চোখে পড়ে নদীর রেখা, ওপারে উঁচু পাড়, গাছগাছালি, কুঁড়েঘর–সবকিছুই সন্ধ্যার সূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। রবীন্দ্রর মনে হয়েছিল, ঠিক যেন এক পারে প্রলয় এবং অন্য পারে সৃষ্টি।

সেই সন্ধ্যায় সবাই মিলে বেরিয়েছিল বেড়াতে। চোখ বুজলে মনে হয়, 'সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমে যেতে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এত প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্ছে সেই বা কি আশ্চর্য লিখন–আর এই ক্ষীণ পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ঐ ছবির মধ্যে পরপার ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ–এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা।'

সন্ধ্যাবেলা চরটা মায়াবী হয়ে উঠলে যে যার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বলেন্দ্রনাথ একদিকে, অনুচরসহ ছেলেরা একদিকে, রবীন্দ্র নিজে একদিকে, আর মৃণালিনী তার বান্ধবীসহ অন্যদিকে। এর মধ্যে সন্ধ্যা ঘনায়, আকাশের রঙ মিলিয়ে যায়, চারদিক অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রর মনে হয়েছিল, 'ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে–পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নার চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়–কোথায় বালি, কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী, কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভাবি একটা অবাস্তবিক মরীচিকা জগতের মতো বোধ হয়।'

এই মায়া-উপকূলে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে রবীন্দ্র দেখতে পেয়েছিলেন ছেলেরা ছাড়া আর কেউ বোটে ফেরেনি। যে যার মতো তো ফিরবেই। এই ভাবনায় স্বস্তি নিয়ে তিনি আরাম কেদারায় বসে বই পড়ছিলেন। বাতির ঝাপসা আলোয় চোখ ধরে আসছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরও কেউ ফিরছে না দেখে বইটিকে ঘাটের ওপর রেখে বেরিয়ে এলেন। চারদিকে কারও দেখা নেই–সমস্ত ফ্যাকাসে ধু ধু করছে।

বলেন্দ্রনাথকে চিৎকার করে ডাকেন তিনি। তার জোর চিৎকারে বলু নাম দশ দিকে ছড়িয়ে যায়, কিন্তু কোনো সাড়া নেই। তার চিৎকার শুনে গফুর, প্রসন্ন আলো নিয়ে বের হলো–বোটের মাঝিরা ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেল। বলু, বলু–রবীন্দ্র সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিলেন। প্রসন্ন চেঁচাচ্ছে 'ছোট-মা-আ'–আর মাঝিদের কণ্ঠে বাবু, বাবু ধ্বনি। কিন্তু কোনো প্রতিউত্তর নেই। একসময় গফুর চেঁচিয়ে উঠল, দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি, পরক্ষণেই না, না করে রব ওঠাল–রবীন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কী হয়েছে অনুমানও করতে পারছিলেন না। ওরা কি চোরাবালিতে ডুবে গেল, নাকি বলুর মূর্ছা কিংবা অন্য কিছু ঘটল, নাকি সাপ বা–। নাহ্, কোনো কিছু ভাবা যাচ্ছিল না। তার ভেতর এক নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল লণ্ঠনের আলো–সবকিছুর ভেতর ডুবে গিয়ে তার চেতনা অসাড় হয়ে এসেছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে মৃণালিনী এবং তার সহচরীর খোঁজ মিলল। জানা গেল তারা চড়া বেয়ে ওপারে গিয়ে পড়েছিলেন, আর ফিরতে পারছিলেন না। বলেন্দ্রনাথ জেলেদের ধরে পথ খুঁজে পেয়েছিল। শেষে বোট পাঠিয়ে উদ্ধার করা হয়েছিল তাদের। বলু তো বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। বারবারই বলছিল, 'তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বের হবো না।' এভাবে শেষ হয়েছিল অ্যাডভেঞ্চার। সকলে এত শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অনুতপ্ত ছিল যে রবীন্দ্র কাউকে কিছু বলতে পারেননি। যদিও ভর্ৎসনা করার জন্য একটি বাক্য ঠিক করেছিলেন–'আত্মরক্ষায় অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' এসব ভাবনা মনে করে মজা পাওয়ার কারণে মৃণালিনীকে লেখা চিঠিটা আর শেষ করা হলো না। কাগজ-কলম গুটিয়ে রাখলেন। সেদিন রাতে মৃণালিনীকে বুকে নিয়ে ঘুমোনোর সময় আস্তে করে বলেছিলেন, তুমি কি রাগ করেছ?

করেছিলাম। এখন আর রাগ নেই।

বকাবকি করার জন্য যেসব বাক্য ঠিক করেছিলুম সব বুকের মধ্যে আটকে রেখেছি। এসো ঘুমোই।

এতেই হবে। না, হবে না, আরও চাইবার আছে।

চাওয়া কখন পূরণ করব?

রাতে এবং ভোরে।

দু সময়ের দুটোই কি একই রকম চাওয়া।

ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলে, না, একই রকম না। রাতে এক রকম আর ভোরে আর এক রকম। রাজি তো?
রাজি। রাতেরটা বুঝলুম। ভোরেরটা কি?
যতসব উপাদেয় খাবার। নিজ হাতে বানাবে।
এই কাজটিই তো আমি সবচেয়ে ভালো পারি।
দুজনের হাসিতে রাত গাঢ় হয়। বোটের ভেতরে শুয়ে নদীর কুলুধ্বনি কানে বাজে। পদ্মার বয়ে যাওয়া দিন এবং রাতের অষ্টপ্রহরে একই লয়ে সংগীতের মূর্ছনা।
আজও এই মুহূর্তে নদীর কথা মনে করে আরাম কেদারায় ঘুমিয়ে পড়েন রবীন্দ্র। কলকাতায় গেলে সবাইকে কাছে পাবেন এমন একটি চিন্তায় তার ঘুম গাঢ় হয়। যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেন তিনি। বনমালী এসে মৃদুস্বরে দুবার ডাকে। তার ঘুম ভাঙে না। নিচে গিয়ে বনমালী নায়েবকে বলে, বাবুমশায় ঘুমোচ্ছেন। দুবার ডাকলুম। উঠলেন না।
আমি অপেক্ষা করছি। ভীষণ দরকার। তুই একটু পরপর গিয়ে দেখবি ঘুম ভাঙল কি না।
চা খাবেন?
নিয়ে আয়। মিষ্টিটা বেশি করে আনিস।
বনমালী নায়েবের কথায় বিরক্তি বোধ করে। মানুষটা খেতেও পারে! হাভাতে একটা। গজগজ করে ও।
কয়েক দিন খোঁজাখুঁজি করে নায়েব হরেকের মেয়ে কলির জন্য একটি ছেলে জোগাড় করেছে। এই খবরটি বাবুমশায়কে দেওয়ার জন্যই তার এত তাড়া। বাবুমশায়ের কাছ থেকে বাহাদুরি নিতে হবে তো। কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া কি চাট্টিখানি কথা। নায়েব এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন না। বারবার ওঠেন। পায়চারি করেন। আবার এসে চৌকিতে বসেন। সময় যেতে চায় না।
এ সময় ফিরে আসে যতীন্দ্র। গাঁয়ের চারদিকে ঘুরে-ফিরে ঘেমে-নেয়ে একসার হয়েছে। নায়েবকে দেখে বলে, রবীন্দ্রবাবু তো শুধু জমিদারির কাজের জন্য এখানে থাকেন না। এটা তো তার জন্য স্বর্গবাস। টাকা-পয়সা উপার্জনের চিন্তা না থাকলে যে কেউই এমন স্বর্গ ছেড়ে যেতে চাইবে না।
ঠিকই বলেছেন। বাবু তো শিলাইদহ, পতিসর, শাজাদপুর বলতে পাগল। বোটে থাকতেই তিনি বেশি পছন্দ করেন। আমাকে বলেছেন, এবার কলকাতা থেকে ফিরে এসে বোটে থাকবেন আর লিখবেন।
কাছারি করবেন কখন?
নায়েব মৃদু হেসে বলেন, কাছারিও করবেন, আর কাজ দেখার জন্য আমরা তো আছি।
মানুষটা এত কিছু পারে যে ভাবতে অবাক লাগে। তো তোমাদের খবর কী, ওই জেলের মেয়েটার জন্য ছেলে পেয়েছো?
হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক করেছি। ছেলেটির মাথা আছে। গ্রামের স্কুল থেকে প্রাইমারি পাস করেছে। জেলে পেশায় থাকবে না বলে কলকাতা যাওয়ার চিন্তা করছে। বাপ তো বড্ড গরিব। একটা কিছু কাজটাজ জোগাড় করতে না পারলে–
এ নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমাদের জমিদার ওকে ঠিকই কাজে লাগিয়ে দিতে পারবেন।
তা ঠিক। আপনি আমাদের পাড়াগাঁটা কেমন দেখলেন হুজুর? ভালো লেগেছে?
আমি তো রবীন্দ্রবাবুর মতো কথায় প্রকাশ করতে পারব না, তবে তার কাছ থেকে শুনে শুনে অনেক কিছু মুখস্থ করে ফেলেছি। বেড়াতে বেড়াতে সেসব কথাই মনে হচ্ছিল বারবার। তিনি বলছিলেন, 'আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা। এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম। হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে–ওই টিটি পাখির ডাক-সুদ্ধ এবং ওপারের ওই বাঁধা নৌকায় যে আলোটি জ্বলছে সেটি-সুদ্ধ–এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ওই একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ, এবং ওই নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ।' নায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসে যতীন্দ্র। বুঝলে যে দেখতে পায় সে এমন করেই দেখে। তাদের দেখা ফুরোয় না। প্রতিটি দেখার মধ্যে নতুন আবিষ্কার থাকে।
প্রসন্ন এল চা নিয়ে, সঙ্গে মিষ্টি আর পাকা পেঁপে। বলে, চা দিয়েছি। আর কিছু দেব?
না, না আর কিছু লাগবে না। তুই দেখে আয় বাবুমশায় উঠেছে কি না। আমার খবর দেওয়ার তাড়া থিতিয়ে আসছে। উত্তেজনা মিইয়ে গেলে খবরটা ঠিকমতো দিতে পারব না।
এত অস্থির হতে হবে না নায়েব, মিষ্টি খাও। পেটপুরে খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো। রবীন্দ্রবাবু তো মেয়েটাকে নিয়ে দারুণ একটা কবিতা লিখেছেন। আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। বলেছেন আর একটা স্তবক লিখলেই কবিতাটা শেষ হবে।
মেয়েটার কপাল। এমন কপাল নিয়ে আমাদের যে কেন জন্ম হলো না।

কথা বলতে বলতে গোটা দশেক মিষ্টি শেষ করে ফেলেন নায়েব। যতীন্দ্র তার খাওয়া দেখে মৃদু হেসে বলে, আপনি বেশ ভোজনরসিক। যাই লাইব্রেরিতে একটু বসি।
যতীন্দ্র উঠে যায়। নায়েব ভেতরে ভেতরে ফুলতে থাকেন। বেটা তাকে কথা শুনিয়ে গেল, তাও আবার খাওয়া নিয়ে কথা। কাল চলে গেলেই জঞ্জাল দূর হবে। বাড়িতে অতিথি না থাকলে জমিদারের পেটের ভাত হজম হয় না। অতিথি লেগেই থাকে। তখন ওপর থেকে হাঁক আসে, বনমালী।
আজ্ঞে হুজুর।
বনমালী দোতলায় উঠে যায়। নায়েব তিন-চার চুমুকে চা শেষ করে কাছারিতে গিয়ে বসেন। জানালা দিয়ে দেখতে পান হরেকের মেয়েটা গরুর বাছুরটা নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কী অপূর্ব ছবির মতো দেখাচ্ছে মেয়েটার দৌড়ে যাওয়া–নায়েব মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। আহা, এমন সুন্দর ছবি দেখলে বাবুমশায় ঠিকই একটা কবিতা লিখে ফেলতেন।
দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রও তার কৃষ্ণকলির ছুটোছুটি দেখেন। যেন পুরো শিলাইদহ ওর একার। মেয়েটি ওর গরুর বাছুর নিয়ে এই গাঁয়ে জীবন কাটাবে বলে কোনো স্বর্গ থেকে উড়ে এসে পড়েছে। এখন ওর হাতে অনন্ত সময়। ও খেলবে, নাচবে এবং গান গেয়ে সব মানুষের কানে মধুর সংগীত ঢেলে দিয়ে বলবে, আসো আমরা শস্য ঘরে তুলি। মাছ ধরে আনি, জল তুলে আনি, তারপর আমাদের কর্মকাণ্ড শেষ করি। রবীন্দ্র লাল খাতাটা নিয়ে এসে কৃষ্ণকলির শেষ স্তবক শেষ করেন:

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

লেখা শেষ হলে মহাখুশিতে মনটা ভরে যায়। ভাবেন, একদিন মেয়েটিকে ডেকে সামনে বসিয়ে কবিতাটি শোনাবেন। ও কি বুঝবে?
বাবুমশায়।
হ্যাঁ, তোকে ডেকেছিলুম। যতীন্দ্র বেড়িয়ে ফিরেছে?
ফিরেছেন।
কাছারিতে নায়েব-আমলারা এসেছেন?
এসেছেন। নায়েবমশায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। বলেছেন, জরুরি খবর আছে। নায়েব মশায় দোতলায় আসতে চান।
ডেকে নিয়ে আয়। ওর সঙ্গে কথা বলেই নিচে যাব।
নায়েব সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বনমালী নামার আগেই তিনি উঠে আসেন। গলার স্বরে উত্তেজনা, বলেন, বাবুমশায় হরেকের মেয়ের জন্য একটি পাত্র জোগাড় হয়েছে। ছেলের নাম যোগেন। খানিকটুকু লেখাপড়া করেছে। তবে অভাবের সংসার। মাছ ধরে ওর বাবা সংসারের খর্চা কুলিয়ে উঠতে পারে না।
ছেলেটি কেমন?
স্বাস্থ্য ভালো। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। তবে চেহারাটা বেশ কাটা কাটা। নাক খাড়া। চোখ জোড়া ছোট। হরেকের মেয়ের সঙ্গে মন্দ মানাবে না। আপনার ইচ্ছার কথা শুনে ওর বাপের মুখে তো কথাই সরে না।
ছেলেটা রাজি তো?
কালো মেয়ে বলে একটু গাইগুই করেছে। বাপের ধমক খেয়ে চুপ করে গেছে। আমার মনে হয় বিয়ের পর কাছারিতে একটা কাজের ব্যবস্থা করলে ঠিক হয়ে যাবে।
ঠিক বলছ তো নায়েব?
একদম মিথ্যে না বাবুমশায়।
ঠিক আছে যাও। বিয়ের ব্যবস্থা করো। কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না হয়।
নায়েব চলে গেলে যতীন্দ্র উত্তেজিত হয়ে দোতলায় উঠে আসে। বলে, আপনার এখানে আজ একটি দারুণ দৃশ্য

দেখলুম।
তুমি তো বেড়াতে বেরিয়েছিলে।
তখন দেখিনি, দেখলুম এখন। জানালা দিয়ে।
কী এমন দৃশ্য, যা তোমার এত ভালো লেগেছে।
আপনার মতো কথায় প্রকাশ করতে পারব না।
আহা, বলোই না, দৃশ্যটা কী?
দেখলুম একটি কিশোরী একটি বাছুর নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আহা কী অপরূপ! চারদিকে খোলা মাঠ, আকাশ, নদী ওর সঙ্গে এক হয়ে গেছে। ও যেন মা দুর্গা হয়ে নেমে এসেছে আপনাদের ঠাকুর এস্টেটে। আমি এমন করে কোনো দিন কিছু দেখিনি। স্বপ্নের মতো লাগছে আমার।
ও-ই তো আমার কৃষ্ণকলি।
হ্যাঁ, আমি তো জানি। আপনি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাও শুনেছি। ভগবান ওর মঙ্গল করুন। সোনার মেয়ে একটা।
প্রসন্ন দুই গ্লাস শরবত নিয়ে আসে। রবীন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, জল খাও যতীন। উত্তেজনায় তোমার গলা শুকিয়ে গেছে। তুমি এমন করে এখানকার মানুষকে দেখেছ ভেবে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে। বুঝতে পারছি তোমার স্মৃতিতে শিলাইদহ টিকে থাকবে।
যতীন্দ্র মাথা নেড়ে এক চুমুকে লেবুর শবরত খায়। রবীন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, মেয়েটার বিয়েতে থাকলে পারতে।
পারলে ভালো লাগত, কিন্তু পারছি না। কলকাতায় গিয়ে ওর জন্য একটা শাড়ি কিনে পাঠাব। দিয়ে দেবেন।
শাড়ি পেলে ও খুব খুশি হবে, ছোট মানুষ তো।
যতীন্দ্রর মনে হয় কবির কাছে এই বিয়ে নিজের মেয়ের বিয়েরই মতো। মানুষটার খুশির সীমা নেই। মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। মানুষকে ভালোবাসার এমন নিঃস্বার্থ প্রাণ নিয়ে জমিদার হওয়া যায় এটাও অভিজ্ঞতা লাভের বড় অংশ বলে মনে হয় যতীন্দ্রর।
ওর বারান্দার রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে তাকালে দেখতে পায় মেয়েটি নেই। কোথায় গেল ও? গৃহে। গৃহ ওর জন্য নয়, ওর প্রাণের ভেতর নদী আছে। নদী ওর। আকাশ আছে। আকাশ ওর। স্নেহ পাওয়ার মানুষ আছে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওর এবং একই সঙ্গে কবিও ওর। কবির কবিতায় ওর ঠাঁই হয়েছে।
যতীন্দ্র পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পায় রবীন্দ্র নেই। ঘরে ঢুকেছে, গুনগুন করে গাওয়া গানের সুর ভেসে আসছে। যতীন্দ্র কান পেতে সেই সুর শোনার চেষ্টা করে। নিজেও গুরুত্ব নিয়ে বলে, আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে।
বেশ ধুমধাম করেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। জমিদারের হুকুম ছিল গাঁয়ের একজন দরিদ্র মানুষও যেন বিয়ের অন্ন থেকে বাদ না পড়ে। অনুষ্ঠান শেষে একদল বাউল গানে মাতিয়ে তোলে উৎসব প্রাঙ্গণ। রাতভর মানুষ ভাত খেয়ে, গান শুনে বাড়ি ফেরে। সবার এক কথা, কতকাল এ গাঁয়ে এমন উৎসব হয়নি। আমরা একসঙ্গে ভাত খাইনি। একসঙ্গে বসে গান শুনিনি। একসঙ্গে রাতের অন্ধকার মাতাল করে দিয়ে বাড়ি ফিরিনি। আমাদের কপালে এত সুখও ছিল।

এখন রাতের শেষের প্রহর।
মেয়েটিকে তার স্বামী সরাসরি বলে, আমি বাবার হুকুমে বিয়ে করেছি।
মেয়েটি নিশ্চুপ। ওর মুখে কথা জোগায় না। স্বামী এভাবে কথা বললে তার কী উত্তর দিতে হবে, সে কথা কেউ ওকে শেখায়নি। ও নিজেও জানে না।
ওর স্বামী আবার বলে, এ বিয়েতে আমার মত ছিল না।
ও তখন বুদ্ধি করে বলে, তাহলে মত করলেন কেন?
ও চেঁচিয়ে বলে, এই কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেব নাকি?
না দিলে দেবেন না।
আর একটা কথা বললে আমি তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।
মারতে হবে না। সকালে আমি বাবার বাড়ি চলে যাব।
তুমি বাবার বাড়ি চলে গেলে আমার বাবা আমাকে মেরে শেষ করবে।
মেয়েটি আবার চুপ করে যায়। ও আর কি বলবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ছেলেটি দুর্দশায় পড়বে শুনে ওর

খারাপ লাগে। ও ঘোমটা টেনে বসে থাকে।

ছেলেটি তখন হারিকেনের মৃদু আলোয় লিখতে বসে। ও কী লিখছে মেয়েটি তা জানে না। লেখা শেষ করে কাগজটা ভাঁজ করে ও মেয়েটির হাতে দিয়ে বলে, এই চিঠিটা জমিদারবাবুকে দেবে। তুমি পড়বে না।

আমি তো পড়তে জানি না।

জানো না ভালো হয়েছে। এখন মরো।

মেয়েটি আতঙ্কে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকায়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্বামী তাকে এমন সব কঠোর কথা শোনাচ্ছে যে ভয়ে ওর প্রাণ শুকিয়ে গেছে। ওর ঘুম পাচ্ছে। ওর অভ্যেস সন্ধ্যা হলে ঘুমিয়ে পড়া। ওকে তো কখনো সারা রাত জেগে থাকতে হয়নি। চিঠিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে চৌকির কোনায় ও গুটিসুঁটি হয়ে শুয়ে পড়ে।

ছেলেটি দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। মেয়েটি জানতেও পারে না।

পরদিন ভোরে ছেলেটির মা-ই প্রথমে দেখতে পায়, ঘরের পেছনের পেয়ারা গাছের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে তার প্রথম সন্তান যোগেন।

ও বাবা যোগেন–যোগেন রে–

মায়ের আর্তচিৎকারে ছুটে আসে অন্যরা।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাড়িসুদ্ধ লোক। যোগেন যেন ঘুমিয়ে আছে, দুই চোখের পাতা বোজা। এমন নিরিবিলি প্রশান্ত ঘুমের সময় ওর জীবনে বুঝি আর হয়নি। শুরু হয় কান্নার রোল। সেই শব্দে ঘুম ভাঙে মেয়েটির। কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না। কোথায় যাবে জানে না। ও কারও আসার অপেক্ষায় ঘরের ভেতর বসে থাকে। কিন্তু ওর কাছে কেউ আসে না।

কদিন পরে ও একটি সাদা থান পরে বাবার সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসে। স্বামীর চিঠিটি জমিদারবাবুকে দেবে বলে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখে। ওর আঁচলের খুঁটটা পরখ করে দেখার জন্য কেউ ওর দিকে তাকায় না। পুরো বাড়ি তো ছেলের শোকে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

আরও কত দিন পরে রবীন্দ্র কলকাতা থেকে ফিরে আসেন।

প্রসন্ন ভোর। স্নিগ্ধ বাতাস চারদিকে। অনেক দূর থেকে গগন হরকরার গলা ভেসে আসে। অথচ কাল রাতটা ছিল অন্য রকম। তার বর্ণনা একটা টুকরো কাগজে লিখতে বেশ লাগছিল। ‘দুই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্তত করচে। সকালে হয়তো উত্তুরে বাতাস জলে-স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল, সন্ধ্যাবেলায় শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিণে বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল। বসন্ত অনেকটা এসে পৌঁছেছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেক দিন পর আজকাল ওপারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে। আজকাল সন্ধ্যা হলে ওপারের গ্রাম থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, লোকে দরজা-জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার জন্য তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমা রাত।’

রাতের পূর্ণিমার সঙ্গে দিনের স্নিগ্ধতার যেন বেশ যোগ আছে। কলকাতায় সময়টা চমৎকার কেটেছে। সব মিলিয়ে ফুরফুরে দিনের সূচনার ভাবনা রবীন্দ্রকে প্রফুল করে রাখে।

সকালে নদীর ধারে বেড়াতে যাবেন ভেবে তৈরি হয়ে নেন। মোজা পরার সময় বনমালী ওপরে উঠে আসে।

বাবুমশায়।

কলকাতায় এবার বেশ আনন্দ করেছিরে বনমালী। ওরা সবাই ভালো আছে। তোদের মা-ঠাকরুণ তোদের কথা খুব করে জিজ্ঞেস করেছে। তার কথা যেন ফুরোতে চায় না। উত্তর দিতে দিতে আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

হাঃ হাঃ করে হাসেন রবীন্দ্র। বনমালী কোনো কথা বলে না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সরাসরি বনমালীর দিকে তাকান। ওর বিষণ্ন মুখ দেখে ভুরু কুঁচকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে রে?

নিচে চলুন, দেখবেন।

বনমালী দ্রুত সামনে থেকে সরে যায়। রবীন্দ্র নিজেও দেরি না করে দ্রুত নেমে আসেন। বাগানের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে হরেক, সঙ্গে এক হাত খোমটা দেওয়া পঁটুলির মতো কিছু একটা। বোঝা যায় মানুষ, কিন্তু মুখ দেখা যায় না। রবীন্দ্রকে দেখে হরেক তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

বাবুমশায় আমার সর্বনাশ হয়েছে।

হরেক মাটিতে মাথা কোটে। পাশে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি। রবীন্দ্র বনমালীর দিকে তাকান। বনমালী অনুচ্চ

কণ্ঠে বলে, বিয়ের পরদিনই ছেলেটি গলায় ফাঁস দিয়েছে।

স্তব্ধ রবীন্দ্র দেখতে পান সাদা থানে মোড়ানো মেয়েটি ঈষৎ নড়ে উঠেছে–ওর দুরন্ত কৈশোর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ওর মাথায় ঘোমটা উঠেছে, মুক্ত বেণী কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথের সামনে একটি ধ্বংসস্তূপ চেতনালোকের সবটুকু পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোনো দিন কোনো বাক্য লেখেননি তিনি। শিলাইদহের পটভূমিতে শুধুই সাদা পুঁটলির এক বিশাল আকৃতি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

হরেকের কান্না থেমেছে। অকস্মাৎ চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘুঘুও ডাকে না। চড়ুইয়ের কিচিরমিচিরও নেই। আনন্দী বোষ্টমী বুঝি শিলাইদহ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। হরেক সেই স্তব্ধতা ভেঙে বলে, আমার মেয়েটি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছে বাবুমশায়।

তুমি কি বলতে যাও বলো কৃষ্ণকলি।

আমার স্বামী আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছে।

চিঠি!

রবীন্দ্রর অস্ফুট ধ্বনির কোনো জবাব দেয় না মেয়েটি। আঁচলের খুঁট খুলে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া এক টুকরো কাগজ ঘোমটার আড়াল থেকে বের করে দেয় সে। নিরাভরণ শুকনো হাতটির মুঠি থরথর করে কাঁপে। বনমালী কাগজটি নিলে সে হাত আবার কাপড়ের আড়ালে চলে যায়।

আসি বাবুমশায়।

হরেক মেয়েকে কাছে টেনে বলে, চল মা।

দুজনে বাগান পেরিয়ে চলে যায়। বনমালীও কাজে যায়।

বাগানের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে থাকেন রবীন্দ্র। দোমড়ানো কাগজটি খুলে সোজা করেন। আঁকাবাঁকা অক্ষর। বড় বড় করে লেখা: 'আমি জমিদারের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য বিবাহ করিয়াছি। এই বিবাহে আমার নিজের ইচ্ছা পূরণ হয় নাই। কালো মেয়ে লইয়া আমি ঘর করিতে পারিব না। তাই মরণই আমার জন্য ভালো। আমি নিজের ইচ্ছায় আত্মহনন করিলাম। বিদায় শিলাইদহ।–যোগেন'

কাগজের টুকরোটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে আসেন রবীন্দ্র। হরেক এবং তার মেয়েকে কোথাও দেখা যায় না। ওকে আর কোনো দিন খোলা মাঠে দেখা যাবে না। ভীষণ কষ্টে নিজের বুকের ওপর মুখ রেখে ভাবে, 'রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়–মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়ানৌকার মতো পারাপার হচ্ছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যায়, এই সংসারের হাটে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়–কিন্তু এই অনন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু-আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশি দিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল-কাতরতা-পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ওই অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। "ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরু মর্মর পবনে" ইত্যাদি। যেখানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন, সংকুচিত, সেখানে মানুষের খুব কর্তৃত্ব–মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে, আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেখে দেয়–পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবনচরিত লেখে এবং মৃতদেহের ওপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্মাণ করে–তার পর অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয়, কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারও খেয়ালে আসে না।'

এভাবেই জীবন এবং জীবনের টানাপড়েন। ঘটনাটি যে তাকে তার ভাবনার জগতের কোথায় নিয়ে যাবে, তিনি জানেন না। বারবার মনে হয় বিয়েটা কি এতই ভুল ছিল? ছেলেটা গেল, এবং মেয়েটা? হ্যাঁ, মেয়েটাও গেল। এই সমাজের কারও কাছে ওর মুক্তি নেই। সমাজ ওকে অন্ধকার গুহায় ঠেলে রাখবে। ভাবতে ভাবতে কখন নদীর ঘাটে এসে পড়েছেন টের পাননি। একসময় দেখতে পান হরেক ওর মেয়ের হাত ধরে এদিকেই আসছে। রবীন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়েন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজের টুকরোটা আছে কি না পরখ করেন।

বাবুমশায়।

তোমার ঘোমটাটা ফেলে দাও কৃষ্ণকলি।

না। হরেক রক্তচক্ষু তুলে মেয়েকে শাসন করে এবং ওর হাত চেপে ধরে।

তোমার মেয়েকে আমি আবার বিয়ে দেব।

না। ও এখন বিধবা। বিধবার দ্বিতীয় বিয়ে হবে না।
তুমি না ওর বাবা হরেক।
বাবা হয়েছি তো কী হয়েছে, আমি তো সমাজেরও লোক।
রবীন্দ্র বুঝতে পারেন হরেক শুধু দরিদ্র প্রজা নয়, এই মুহূর্তে ও এক কিশোরী বিধবার পিতা, সমাজের দণ্ডটা ওর নিজের হাতেও আছে। তাই ওর কণ্ঠস্বর বদলে গেছে এবং দৃষ্টিও। রবীন্দ্র বুঝে যান যে জমিদারের ক্ষমতা দিয়েও তিনি শিলাইদহের প্রকৃতি এই কিশোরীর জন্য অবারিত করে দিতে পারছেন না। সেই ক্ষমতাই তার নেই।
মেয়েটাকে তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে নিয়ে এসো।
না, তার আর দরকার নেই। আমি জানতে এসেছিলাম যে যোগেন চিঠিতে আপনাকে কী লিখেছিল।
লিখেছিল কালো মেয়েকে বিয়ে করে তার ইচ্ছা পূরণ হয়নি।
মেয়েটি চমকে তাকায়। মাথার ঘোমটা পড়ে যায়। পোড় খাওয়া মুখে ওর গায়ের রঙ আরও কালো দেখায়। ও তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আপনি না আমাকে কৃষ্ণকলি বলেন, তাহলে আমার স্বামী পারল না কেন?
ওর দুচোখ জলে টুপটুপ করে।
রবীন্দ্র ওকে সান্ত্বনার কথা শোনান না।
আয় মা।
হরেক ওর হাত ধরে টানে। আবার ওর মাথায় ঘোমটা ওঠে। ওরা গাছগাছালির আড়ালে হারিয়ে যায়।
রবীন্দ্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।